নজরুল ইসলাম

কিশোর জীবনী

হায়াৎ মামুদ

দুখিনী মায়ের দুঃখী সন্তান।
দুয়োরানীর ছেলে অনাদরেই তো মানুষ
হয়। মা তার গর্ভধারিণী জননীও বটে,
আবার মাতৃস্বরূপা স্বদেশও বটে। ডাগর
চোখের শ্যামলা ছেলে কিন্তু ধীরে-ধীরে
বড়ো হয়। বড়ো তাকে হতে হয়
মায়ের দুঃখ ঘোচাবে বলে।

তার চোখে গহীন স্বপ্ন
খেলা করে। বুকের মধ্যে বাঁধা থাকে
সাহস। আর তার কণ্ঠে গান লুকিয়ে থাকে
যেন পোষমানা বুলবুল। যুদ্ধে যাবার
এই তিনটিই তার অস্ত্র।

দুয়োরানীর ছেলেকে কিন্তু কেউ
চেনে না। লড়াই-জেতা ছেলেটার পরিচয়
চায় পথিকজন। কে গো তুমি?
চেহারা দেখে চেনা যায় না।
তার লেখা পড়েও যে ধরা যায় না।
হিন্দু না মুসলিম? বৌদ্ধ না খ্রিষ্টান?

কী তার পরিচয়?
ধাঁধায় পড়ে সবাই।

তুমি তবে কে? বাঙালি।
নাম? কাজী নজরুল ইসলাম।

www.alorpathsala.org

নজরুল ইসলাম

কিশোর জীবনী

হায়াৎ মামুদ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
আলোকিত মানুষ চাই
অন্তর্ভুক্তি নং
স্থাপিত-১৯৭৮
বইটিকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করুন

প্রতীক

© হায়াৎ মামুদ

প্রথম প্রকাশ : ১২ ভাদ্র ১৩৯০/২৯ আগস্ট ১৯৮৩
পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০২ / অক্টোবর ১৯৯৫
পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪১৩ / জুন ২০০৬
পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪১৪/ এপ্রিল ২০০৭
পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪১৫/ জুন ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪১৭/ মার্চ ২০১১

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য : ১০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 446 - 026 - 3

NAZRUL ISLAM : KISHOR JIBANI [Nazrul Islam : A Biography for Juveniles]
by Hayat Mamud
Published by PROTIK 38/2 ka Banglabazar (Ist floor), Dhaka-1100
Reprint : March 2011. Price : Taka 100·00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
ফোন : ৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com, protik77@aitlbd.net

শমী বাবু ও
আসিম বাবু-কে
তোমরা বড়ো হয়ে পড়বে ব'লে
বড়ো কাকু

www.alopathsala.org

নিবেদন

আজ থেকে বছর পঁচিশেক আগে একটা বই লিখেছিলুম রবীন্দ্রনাথ নিয়ে, তোমাদেরই জন্যে। এদেশের কিশোর-কিশোরীর দল, তোমাদের বয়সী যারা, তারা পড়বে বলে। আমার সৌভাগ্য, তখন যারা তোমাদের বয়সী ছিল সে-বই তাদের তখন ভালো লেগেছিল। এখন তারা তোমাদের বয়সকে দূরে ফেলে রেখে এসেছে। 'নজরুলকে নিয়েও ও-রকম একটা জীবনী লিখুন না!'—এই কথাটা বহু বছর ধরে, তাদের অনেকেই, আমার শুভার্থী ও প্রিয়জন নানা সময়ে নানাভাবে আমাকে বলেছেন। সেও আমার এক সৌভাগ্য।

তা, শেষ পর্যন্ত জীবনীটি লেখা হয়ে গেল। লিখতে যে হল তার কারণ, মনে হল — না, আমি যেমনভাবে চাই ঠিক তেমনিভাবে নজরুল-জীবনী তোমাদের জন্যে কেউ তো লিখলেন না।!

কথায় আছে, কৈ-এর তেলে কৈ ভাজা। এও তেমনি। নজরুলের সমসাময়িকদের রচনা থেকেই সব উপকরণ পেয়ে গেছি, আমি শুধু সাজিয়ে নিয়েছি নিজের মতো করে। যাঁদের রচনা সর্বাধিক কাজে লেগেছে আমার তাঁরা হলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আবদুল আজিজ আল-আমান ও ডক্টর রফিকুল ইসলাম। অবশ্য এঁদের বাইরেও এত জন আছেন যে নামেরই এক দীর্ঘ তালিকা হয়ে যাবে। আসলে কবির বন্ধুবৃত্তের পরিধি ছিল বিশাল, এবং তাঁর সংস্রবে যাঁরাই এসেছেন তাঁরাই কিছু না কিছু লিখেছেন; তাঁদের সব রচনায় যে-নজরুল টুকরো-টুকরো ছড়িয়ে আছেন, আরও মালা গাঁথা হল এই বইয়ে। সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ, আমি ঋণী।

এ-বই প্রথম বেরিয়েছিল বাংলা একাডেমী থেকে। তারপর টুকটাক ভুলভাল সংশোধন করে প্রকাশ করেছিলেন প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা। এবারেও তাঁরাই ছাপলেন, কিন্তু বইটি আর এক রইল না। আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত হয়েছে, অসাবধানতাজনিত ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে বেশ কিছু। বর্তমান সংস্করণে বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নির্ধারিত বানান অনুসরণ করা হয়েছে, কিন্তু উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বানানে হাত দেওয়া হয় নি, যেমন— ঊর্দ্ধ আবর্জ্জনা দুর্ম্মদ পুলিস ইত্যাদি; একই উদ্ধৃতিতে হয়তো একই শব্দের বানানে তারতম্য আছে, সেখানে ত্রুটি সংশোধন করে বানানে সমতাবিধানের চেষ্টা করি নি।

গ্রন্থশেষে নির্ঘণ্ট তৈরিতে সাহায্য করেছে শ্রীমতী লোপামুদ্রা মামুদ; তাকে আশীর্বাদ করি।

হায়াৎ মামুদ

১০২/ক, দীননাথ সেন রোড
ঢাকা-১২০৪
আশ্বিন ১৪০২/অক্টোবর ১৯৯৫

১

সেই যুগটাই ছিল অন্য রকম। খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয় যে বলা যাবে যুগ-যুগ আগে; আবার এত কাছেরও নয় যে বলতে পারি এই মাত্র সেদিন, কিংবা কয়েক বছর আগে। সময়ের দূরত্ব আর কতখানিই-বা! এক শ' বছরও তো পেরোয় নি এখনো। তবু, প্রায় শ' খানেক বছর আগের সেই সময় আর এখনকার এই সময়—দুটোর মধ্যে কতই না আকাশ-পাতাল তফাৎ। সেদিনের সে-দেশটাই তো আর নেই। তখন যা ছিল একটা গোটা দেশ, আজ অনেক দিন হল তা ভেঙে হয়েছে দু' টুকরো। একটার নাম পশ্চিমবঙ্গ, আর অন্যটা বাংলাদেশ। অথচ তখনকারও মানুষজন ছিল আজকের মতোই। এদেশের সবাই তো প্রায় গাঁয়ের মানুষ। শহরে ক'জন লোকই-বা থাকে, আর তা ছাড়া শহরের সংখ্যাই আর কত? আজকের মতো তখনো সেই অখণ্ড বঙ্গদেশে গ্রামই ছিল আসল। গাঁও-গেরামের মানুষ, চালচুলো নেই, পেটে ভাত নেই, পরনের কাপড় ততটুকুই যতটুকু না-থাকলেই নয়। রোগে চিকিৎসা নেই, শিক্ষার সুযোগ নেই। খরা হয়, বৃষ্টি হয়। মাঠ জ্বলেপুড়ে যায়, ফসল হয় না। ঘরেতে অন্ন নেই। আকাশ জুড়ে দাপাদাপি করে কালো মেঘ, বৃষ্টি নামে—বৃষ্টি নামে অঝোর ধারায়; খাল-বিল ভরে যায়, ফুলে ফুঁসে ওঠে নদী। বান ডাকে। জল থৈ থৈ সব। বন্যার স্রোতে ভেসে যায় ঘরবাড়ি মানুষজন। বৃষ্টিতে প্লাবনে হেজে পচে মরে যায় সব। ফসল হয় না। ঘরেতে অন্নের অভাব। এই তো বঙ্গদেশ। তখনো যা, এখনো তাই। তবুও, সে-যুগটা ঠিক এখনকার মতো ছিল না।

'সেই যুগ' মানে এখন থেকে পঁচানব্বই বছর আগে। দেশে তখন এত বেশি লোক ছিল না। বঙ্গদেশ তখন পরাধীন, ইংরেজদের শাসন চলছে। জমিদারি প্রথা চালু আছে; অর্থাৎ আছে জমিদার, নওয়াব, ক্ষুদে রাজা-মহারাজা। কলকারখানা এত হয় নি, চাষবাসই লোকের মূল সম্বল। গ্রামের মধ্যে যারা ধনী এবং শহরে থাকত, তারা বছরে মাত্র দু-এক বার উৎসবাদি উপলক্ষে গ্রামে ফিরত শুধু দিন কয়েকের জন্যে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ইচ্ছে হলেই তখন ছুটে যাওয়া যেত না; কারণ রাস্তাঘাট এত হয় নি, যানবাহনও এত ছিল না। উড়োজাহাজ চোখে দেখে নি কেউ। রেলগাড়ি চড়া—সে তো জীবনের এক বিরাট অভিজ্ঞতা। মোটরগাড়িও তাই—চড়েছে আর কে? সেও এক দারুণ সৌভাগ্যের ব্যাপার। চোখে দেখতে পেলেও নয়ন সার্থক। শহর ছিল গ্রাম থেকে অনেক, অ-নে-ক দূরে। গ্রাম আর শহরের ভিতরে যাতায়াত আদান-প্রদান ছিল কম। শহর থাক না তার

ব্যস্ততা ছুটোছুটি নিয়ে। গ্রামে কিন্তু অন্য ধাঁচের চলন। শহরের উত্তেজনার ঢেউ গাঁয়ের কোলে এসে কখনোই আছড়ে পড়ত না। বাইরের পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায় তো যাক, তার কোলাহল গ্রামের কানে এসে পৌঁছয় না। ঘরে-ঘরে তখন রেডিও ট্র্যানজিস্টর ছিল না, পাড়ার মাতবরের বাড়িতেও ছিল না কোনো টেলিভিশন। থাকবে কী করে? এ সবের অনেক কিছুরই তো তখন আবিষ্কার হয় নি, যদি-বা হয়েছে তো এদেশে আসে নি, অথবা এলেও তেমন প্রচার হয় নি।

হয়তো আছে দূরে ভাগ্যবান কোনো গ্রাম। সেখানে আছে রেললাইন, রেল-ইস্টিশান। সারা দিনে সাকুল্যে হয়তো দু' বার গুমগুম শব্দে মাটি কাঁপিয়ে আসে কোনো রেলগাড়ি, কয়লার কালো ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে, তীক্ষ্ণ সুরেলা সিটি বাজাতে-বাজাতে। দু-চার মিনিটের জন্যে হয়তো থামে, তারপর হুস্‌হুস্ ভস্‌ভস্ ধোঁয়া উড়োতে-উড়োতে ফের চলে যায়। কোন্ তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে চলে আসে আর কোথায়ই-বা যায়, কেনই-বা যায়, কে জানে? হয়তো নেমে পড়ে দু-একটা লোক, ইস্টিশানে। শহর ঘুরে গ্রামে ফিরে আসছে। হয়তো বাড়ির অনেক দূরে ইস্টিশান থেকে হাঁটতে-হাঁটতে এক পা ধুলো নিয়ে ঘরে পৌঁছুনো; নয়তো হাঁটাপথের পরে নদী—ডিঙি বা ছৈ-নৌকোয় চেপে ঢেউ গুণতে-গুণতে ঘরে ফেরা। কানে লেগে থাকে রেলগাড়ির ঝক্‌ঝক্ গুম্‌গুম্ আওয়াজ, কানে লেগে থাকে বৈঠা-জলের মাখামাখিতে অবিরাম ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। চোখে ভাসতে থাকে গাড়িঘোড়া, রংবেরংয়ের মানুষজন, সাদাচামড়া সাহেব-মেম, দালানকোঠা, আলো-ঝলমল দোকানপশারির ছবি। শহর দেখে গাঁয়ের মানুষটা ফিরে এসেছে গ্রামে। বাড়ির লোকের শান্তি, গ্রামবাসীদের স্বস্তি—যাক্, ভালোয়-ভালোয় ঘরের ছেলে ঠিকঠাক ঘরে ফিরেছে। ভিড় জমে যায় ঘরের দাওয়ায়, দলিজ-বৈঠকখানার সান-বাঁধানো রোয়াকে, মসজিদ-চত্বরে কি চণ্ডীমণ্ডপে। কলকাতা শহরটা কেমন বটে? সেখানে নাকি টেরামগাড়ি, আর রাস্তায় লোক গিজগিজ? হাইকোর্টটা কত উঁচু? গল্পের ফোয়ারা ছোটে। প্রশ্নের অন্ত নেই, উত্তরেও ক্লান্তি নেই। শহরের সংবাদ অবাক বিস্ময়ে চোখ বড়োবড়ো করে শুনে চলে গাঁয়ের মানুষ। ঢাকা শহরটাই-বা কেমন? কেবল নাকি ঘোড়ার গাড়ি টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ করে ছোটে? নবাববাড়ি? আরে সব্বোনাশ! বুড়িগঙ্গার ধারে সে এক পেল্লাই দালান। সিঁড়িই তার কত! গুণে শুমার করা যায় না। কাছে যেতেই ভয়ে গা ছমছম করে। লালবাগের কেল্লা দেখেছ? সাহেবরা খুব ফর্সা? মেমসাহেবরা পরে কী গো? এমনি সব গালগল্প। শহরের কথা শোনে গ্রামের মানুষ। আবার হয়তো কবে কখনো এ গাঁ থেকেই কেউ এক জন যাবে শহরে। যদ্দিন না সে যাচ্ছে তত দিন এ-গল্প আর পুরোনো হয় না—লোকের মুখে মুখে চলতে থাকে, তারই সঙ্গে সত্যিমিথ্যে নানান কল্পনা এসে মেশে। ঐ এক জন তো শহর দেখে এসেছে, ঐতেই হবে—তার চোখ দিয়েই সারা গ্রামের লোক শহর দেখে ফেলে। আনন্দ ঐটুকুতেই। এর বেশি কেউ কিছু চায় না। শহরের তাক্ লাগানো গল্প শুনতে বড়ো ভালো লাগে। তাই বলে—শহরে যাওয়া? না, দরকার না পড়লে কেউ আবার শহরে যায় নাকি? সে যে এক মহা ভজঘট স্থান। গাঁয়েই শান্তি। কী চুপচাপ! কোনো হৈচৈ হট্টগোল নেই। কিছুতেই কারো তাড়া নেই—সময় বহে চলে নিরবধি। সময় তো আছেই, থাকেই সবসময়। গাঁয়ের লোক জানে না সময়ের ভার কাকে বলে। সবটুকুই তার অবসর। অভাব আছে, সমস্যাও আছে, তবু সময়ের হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে বসে থাকা। এই

উদাসীনতার মধ্যেই তার চিত্তের শান্তি। আর শহর? সকাল-সন্ধ্যার কিনারাই পাওয়া যায় না—কেবল দৌড় দৌড় দৌড়। সবাই বলে, সময় নেই, ছোটো, ছুটতে থাকো, কে আগে পৌঁছয় দেখা যাক। শহরে মানুষ যায়? যাওয়ার কথা মনে হলেই ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় গাঁয়ের মানুষের। এমনিভাবে গ্রাম আর শহর দু' জন দু' দিকে মুখ ফিরিয়ে দূরে-দূরে একা-একা যে যার মর্জি নিয়ে পড়ে থাকে। ভেবে দেখ তো, এখন কি আর সেই গ্রাম আছে?

এ জন্যেই বলছিলুম সেই যুগটাই ছিল আলাদা। সেকালের একটা গ্রাম থেকে আমরা পথ চলতে শুরু করব। একটা গ্রাম এবং সেই গ্রামের এক ছেলে— এই নিয়েই আমাদের গল্প। গ্রাম থেকে শুরু বটে, তবে যাব কিন্তু আমরা অনেক দূর! পথে পড়বে অনেক গাঁ-গেরাম, শহর-বন্দর— দেশের, বিদেশের। আর মানুষজন? সে যে কত রঙের কত ঢঙের! স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে-যেতে কাল থেকে কালান্তরে আমরা চলে যাব। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, এক যুগ থেকে আরেক যুগে। এক জনের সঙ্গে কথা বলা শেষ হল তো শুরু হল পাশের লোকটির সঙ্গে কথা বলা।

অবশ্য, সব কথাই তো থামে একসময়। আমাদের গপ্পোও শেষ হবে। সব রাস্তাই তো শেষ হয় কোনোখানে। আমাদের পথচলাও থামবে। তবু বলে নেওয়া ভালো যে এই পথ অনেকখানি, সময়ও লেগেছে দীর্ঘ। ১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি পথে নেমে গন্তব্যে পৌঁছুনো কোন্ সুদূর ১৯৭৬-এ। চলা শুরু করেছি অখ্যাত কোন্ এক চুরুলিয়া গ্রাম থেকে, আর শেষ হল তা বাংলাদেশের রাজধানী-শহর ঢাকায় এসে।

একেবারেই অজ পাড়া গাঁ। সাধারণ গ্রাম সাধারণত যেমন হয়ে থাকে, এও তাই। ছিরি নেই, ছাঁদ নেই, খেটে-খাওয়া মানুষের বাস। বাপ-দাদাদের রেখে যাওয়া দু'-এক টুকরো জমিজমা চাষবাস করে দিন কাটে। বেশির ভাগ লোকেরই কষ্ট আর অভাবের সংসার। মোটামুটি সব গ্রাম সম্পর্কেই এ-কথা খাটে। চুরুলিয়াও কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। বর্ধমান জেলার একটা গ্রাম। দূরে পড়ে আছে শহর কলকাতা। দু' শ' কিলোমিটারের ব্যবধান। প্রথমে যাও আসানসোল। বড়ো রেলওয়ে স্টেশন। বর্ধমান পার হয়েও অনেক দূর চলে যেতে হবে বিহারের দিকে। আজকাল তীব্র গতিশীল বিদ্যুৎ-রেলেই লাগে চার ঘণ্টা। সেই আমলে এর দেড়া কি দ্বিগুণ সময় কি আর না লাগত? আসানসোল থেকে পাকা রাস্তা। মাইল বিশেক চলে যাও। পেয়ে যাবে চুরুলিয়া। অত আগে কি পাকা রাস্তা ছিল? মনে হয় না। পাকা রাস্তা বলতে তো তখন একটাই। দূর পাল্লার। আসানসোল ছুঁয়েই চলে গেছে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। সংক্ষেপে লোকে বলে জি. টি. রোড। সম্রাট শেরশাহ্ তৈরি করিয়েছিলেন। এই পাকা রাস্তা থেকেই একটা পথ বেরিয়েছে আসানসোলের কাছে, গেছে চুরুলিয়ায়। নিশ্চয়ই মেঠো পথ ছিল সে-সময়। ছোট্ট একটা শাখা-লাইন গেছে আসানসোলের আগের একটা স্টেশন অণ্ডাল থেকে গৌরাণ্ডি অবধি। এরই কোনো একটায় নেমে পড়। তারপর সোজা রাস্তা—চলে যাবে চুরুলিয়ায়। বাস নিয়ে যাবে তোমাকে।

জেলার নাম তো বর্ধমান। কিন্তু মহকুমা কী? আসানসোল। কয়লাকুঠির দেশ। থানা? জামুরিয়া। আর মৌজার নাম হল চুরুলিয়া। বাংলার হাজার হাজার গ্রামের একটি। কিন্তু বৈশিষ্ট্য কি কিছুই নেই? আছে। তবে, তা গ্রামের চেহারায় নয়, আছে এলাকায়। এই গ্রাম এমন এক জায়গায় যার সঙ্গে দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলেরই কোনো মিল নেই।

শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা বঙ্গদেশের এ কোন্ ছবি? মাটি রুক্ষ, রোদে ঝলসানো, পাথর আর কাঁকর-বালি মেশানো, রং কালচে। ঝোপঝাড় বনজঙ্গল এখানে-ওখানে যথেচ্ছ গজিয়ে ওঠে নি তো! চোখ জুড়োনো সবুজ শ্যামলিমার বড়ো অভাব। বিস্তীর্ণ ধু-ধু মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হয়তো কিছু তালগাছ ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে। ছায়া ঐ ওটুকুই। অবশ্য আছে বটে বনশ্রেণী। দূরে। হরীতকী, তাল-তমাল, শাল ও মহুয়ার বন। ছোটোখাটো বৃক্ষরাজি। বিশাল মহীরুহের দল। ভূগোলের বইয়ে বঙ্গদেশই লেখা, তবু যেন যথার্থ বাংলা নয়। বঙ্গভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চল এই রাঢ় ভূমি। পাশেই বিহার। একেবারে অন্য দেশ। তারই ছোঁওয়া, চালচলন, মেজাজ-মর্জি এখানকার প্রকৃতির স্বভাবে। বিহার ও বঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চল এই দেশ। কাছেই বীরভূম। ঠিক পাশের জেলা। একই আবহাওয়া এরও মাটিতে আকাশে। নদী আছে মাত্র একটা। নদীমাতৃক দেশ তো নয়, যেমন পূর্ববাংলা—এখনকার বাংলাদেশ। তার নাম অজয়। নদী নয়, নদ। গরমের মরশুমে বালির চড়া পড়ে যায়, তারই মধ্যে তির্‌তির্ করে বয়ে চলে স্বচ্ছ জলের ক্ষীণ স্রোতধারা। হেঁটেই পার হয়ে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু যেই এসে গেল বর্ষা—অমনি ভরে যায় গাঙ, দু' কূল ছাপিয়ে বান ডাকে। নদী তো অন্য রকম, সবসময়েই তার বুকে পানি। নদের চরিত্র একেবারে আলাদা।

শুকনো ডাঙা খটখটে। বৃষ্টিপাত কম। সূর্যের তাপ পুড়িয়ে দিতে চায় সবকিছু। ভূমি সমতল নয়, এবড়োথেবড়ো, উঁচুনিচু, ঢেউখেলানো। এদিকে ওদিকে উঁচু টিলা। ঐ তো 'চুরুলিয়া গড়' কাছেই। গড় মানে দুর্গ। ছিল কোনো দূর অতীতে। এখন শুধু নামটাই রয়ে গেছে। লোকে বলে, কোনো এক আমলে এই গ্রাম ছিল রাজধানী। রাজা নরোত্তম দাসের। কেউ বলে—না, দাস নয়, নরোত্তম সিংহের। হতেও পারে। কেউ তো আর সত্যিই দেখে নি। কাগজপত্রে ইতিহাসেও লেখা নেই কিছু। লোকের বিশ্বাসটাই চালু থাকে। এক কালে যাই থাকুক না কেন এখানে, সময় সব ধুয়ে মুছে সাফ করে গেছে কবে। ইতিহাস পথ চলতে-চলতে যে-জায়গাটায় এসে থামে সেখানে তখন না আছে কোনো রাজা, না কোনো রাজধানী। স্রেফ একটি দারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রাম।

গ্রামটায় থাকে কারা? হিন্দু আর মুসলমান। এদিক দিয়েও এই গাঁ ভিন্ন কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, মুসলমান হয়তো দু-চার ঘর বেশি। হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। অত আগের খবর কে রেখেছে? আর দশটা গাঁয়ের মতোই এখানেও সেই একই—দুই জাত, দুই সম্প্রদায়। আসলেই কি তাই? জাত প্রকৃতপক্ষে একটাই। মানুষ জাত। তারও বেশি—গরিব জাত। হিন্দু আর মুসলিম। ভাই ভাই, জাত নাই। মুসলমানদের বসতি গ্রামের পশ্চিম দিকটায় গড়ে উঠেছে। সবাই দরিদ্র, কেউই সচ্ছল নয়। এরই মাঝখানে একটা বাড়ি। নেহাতই সাদামাটা। মাটির দেয়াল, খড়ের চাল। এ অঞ্চলে এমনটাই রেওয়াজ। সোজা কথায় কুঁড়েঘর। টিনের চালে বড্ডো গরম। লাল টালির ছাউনি দেয় বড়ো মানুষেরা। গরিব লোকদের জন্যে কুঁড়েঘরই ভালো : বেশ পুরু করে খড়ের ছাউনি, গরমের তাপ পৌঁছয় না ভিতরে, ঘর ঠাণ্ডা থাকে। মাটির দেয়ালে সুবিধেও অনেক। বৃষ্টি কম, তাই এ ভয় নেই যে অবিরাম বর্ষণে দেয়াল ধসে যাবে। গ্রীষ্মের দিনে ঘর শীতল রাখে, আবার শীতকালে তত ঠাণ্ডা হয় না। বাড়িটার পুব পাশেই রয়েছে রাজা নরোত্তমের গড়, আর দক্ষিণ দিকে একটা পুকুর। সবাই বলে হাজী পুকুর। হাজী পালোয়ান নামে এক ফকির নাকি এই রুখু মাটির দেশে পুকুর কাটিয়েছিলেন সে কোন্ আদ্যিকালে। সেই

থেকেই এই নাম। পুকুরের পুব পাশে রয়েছে ফকির হাজী পালোয়ানের মাজার, আর পশ্চিম পাশে একটি মসজিদ।

একটা বাড়ি। তার পাশে পুকুর, মাজার, মসজিদ। এ সবের অর্থ কী? অর্থ একটাই হতে পারে—বাড়ির বাসিন্দা যাঁরাই হোন না কেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নিশ্চয়ই জড়িয়ে আছে মসজিদ আর মাজার। ব্যাপারটা আসলেই তাই। সে আবার অন্য এক গল্প। তবু তা শোনা দরকার, কেননা আমাদের কাহিনীর সঙ্গে সে-গল্পের যোগ আছে।

চুরুলিয়া অঞ্চল যে প্রাচীন তা তো বোঝাই যাচ্ছে। নইলে ঐ চুরুলিয়া গড় বা নরোত্তমের গড় আসে কোত্থেকে? ইতিহাস ইঙ্গিত দেয় যে, একদা বঙ্গদেশের বাহির থেকে কিছু মুসলমান এসে বসবাস শুরু করেছিলেন এখানে। মুঘল আমল তখন চলছে। সে সময়েই একটি পরিবার এলেন বিহারের রাজধানী পাটনার হাজিপুর থেকে। দিল্লীর তখ্‌তে তখন সম্রাট শাহ্ আলম। এখানে সেদিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে একটা আদালত বসেছিল। সেই আদালতেরই কাজী হলেন ঐ পরিবারটির কোনো একজন। তখন থেকে নাম হয়ে গেল কাজী পরিবার। আইনরক্ষায় পরে যদি ঐ পরিবারের আর কেউ নাও থেকে থাকে, তবু 'কাজী' পদবি বহাল রয়েই গেল। সম্রাটের দরবার থেকে দান হিসেবে পাওয়া জায়গাজমিও ছিল বেশ। সময়ের ধাক্কায় ধনদৌলত বা সম্পত্তি ধীরে ধীরে খসে পড়েছিল একে একে, কিন্তু বংশগৌরব তো বিত্তের মুখাপেক্ষী নয়। বংশের কৌলিন্য টিকে থাকল, সেইসঙ্গে স্বভাবেও থেকে গেল বিদ্যাচর্চার ঝোঁক, জ্ঞানের প্রতি দরদ ও আসক্তি। রক্তের ধারা যাবে কোথায়? হাজার হোক কাজী বংশ তো! কাজী মানে বিচারক। শিক্ষা ও জ্ঞান না থাকলে কেউ ন্যায়-অন্যায় বোঝে, না বিচার-ফয়সলা করতে পারে? আর সে-যুগের শিক্ষা মানে মূলত ধর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালাভ। এই ভিটেতেই কবর আছে ঐ পরিবারের কোন্ এক পূর্বপুরুষ হজরত গোলাম নক্‌শ্‌বন্দ্-এর। মাজার রয়েছে ফকির হাজী পালোয়ানের। ফকির বাবার তৈরি পুকুর হয়তো-বা কোনো অলৌকিক মহিমারই চিহ্ন হবে, কে জানে? মাজারের তত্ত্বাবধান দরকার, পূর্বপুরুষের সমাধিতে সন্ধ্যায় দরকার নিয়মিত পিদিম জ্বালানো, মসজিদের জন্যে জরুরি সময়মাফিক আজান দেওয়া কি নামাজ পড়ানো। গৃহে ধর্মনিষ্ঠা ও ভক্তির আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল এই সমস্ত কিছুই মিলেমিশে।

চলে আসছিল এভাবেই। কবে থেকে তা কে বলবে? আমরা যখন তাকিয়ে দেখছি পরিবারটি ততদিনে বিগতমহিমা। অতীতের ধনসম্পদ নেই, বংশগৌরব আছে বটে, কিন্তু একালে তাতে সামাজিক মর্যাদা মেলে না। বিদ্যাচর্চার চল তখনো বজায় আছে ঠিকই, তবে সেই বিদ্যা ঘরে বিত্ত আনে না : ইংরেজ রাজত্বে আরবি-ফার্সির কদর কমেছে, কারো তা দরকারে লাগে না। প্রয়োজন যেটুকু আছে তা বাহিরের নয়, অন্তরের। সেটুকু অন্তত টিকে থাক এই পরিবারে : উপাসনা-বন্দেগিতে, ধর্মসাধনায়, চিত্তের শান্তির জন্যে। তাই-ই থাকল।

১৮৯৯ সালের ২৪শে মে। বাংলা সন ১৩০৬, তারিখ ১১ই জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গলবার। নতুন একটি শিশুর আগমনে মুখর হয়ে উঠল কাজী-বাড়ি। কাজী আমিনউল্লাহ্‌র পুত্র কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয়া পত্নী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান ভূমিষ্ঠ হল।

নবজাতকের নাম রাখা হল : কাজী নজরুল ইসলাম।

২

ভাঙা ঘরে চাঁদের কণা। হোক না গরিবের সংসার, তবু বাড়িতে আশীর্বাদের মতো নতুন অতিথি এলে কার না আনন্দ হয়? পিতা কাজী ফকির আহ্‌মদ কি মা জাহেদা খাতুনের মনে তো বটেই, এমনকি হয়তো-বা পাড়াপড়শি কিংবা জ্ঞাতিকুটুম্বদের মনেও খুশির জোয়ার এসেছিল। প্রথম সন্তান পুত্র কাজী সাহেবজানের পর চার-চারটি পুত্র একে একে অকালে বাপ-মায়ের কোল খালি করে চলে গেছে। তার পরে এসেছে এই ছেলে। আনন্দ-উল্লাসের সঙ্গে আশঙ্কাও উঁকি দেয় : এ ছেলেও সবাইকে কাঁদিয়ে চলে যাবে না তো? না, ছেলেটি বেঁচে ছিল। ছেলেমেয়ের ভালো গোছের একটা সভ্যভব্য নাম তো দিতেই হয়। থাকুক না : কাজী নজরুল ইসলাম। পোষাকী নাম। যত্নে আদরে শিকেয় তোলা থাক। সবসময়ে কাজ চালানোর জন্য বরং সহজ সরল দুখু মিঞাই ভালো। দুঃখের সংসারে এসে পড়েছে বলেই এই নাম? নাকি চার অকালমৃত পুত্রের শোক মনে করিয়ে দিল বলেই এমন নাম? যাক গে, নামে কি যায় আসে! সোনার টুকরো বেঁচেবর্তে থাকুক। দুখু মিঞার আরো একটি ভাই হয়েছিল, কাজী আলী হোসেন। তার পরেতে একটিমাত্র বোন, উম্মে কুলসুম। গাঁ-গেরামে বলে, মেজ ছেলে পয়মন্ত। তাই হোক না আমাদের দুখু মিঞা।

জাহেদা খাতুনকে ছাড়া আরো এক জনকে বিবাহ করেছিলেন ফকির আহ্‌মদ। এই মায়ের ঘরে কোনো ভাই ছিল না দুখুর। বৈমাত্রেয় বোন ছিল এক জন, নাম—সাজেদুন্নেসা।

সংসার সচ্ছল না হলে কী হবে, খাওয়ার লোকের তো কমতি নেই। সকলে বেঁচেবর্তে থাকলে মাথা গুণতি বারো জন হয়। যারা নেই তাদের বাদ দিয়ে সংখ্যাটা এমন কিছু কম নয়। কাজী ফকির আহমদের সংসার কীভাবে চলত আমরা কেউ জানি না। দুখু মিঞা একদিন বড়ো হবে, অনেক বইপত্তর লিখবে সে। এক কথায় লোকে চিনবে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে, কিন্তু তিনিও কিছু লিখে যান নি তাঁর শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি নিয়ে। আমরা কেবল এইটুকুই জানি যে, বংশানুক্রমিকভাবে মসজিদের ইমামতি আর মাজারে খাদেমগিরি করার ভার পেয়েছিলেন পিতামহ কাজী আমিনউল্লাহ্‌। তাঁর অবর্তমানে সেই ভার বর্তেছিল তাঁর পুত্র কাজী ফকির আহমদের ওপর। পরিবার ভরণপোষণের জন্যে এই ধর্মীয় দায়িত্বপালন কোনো রকমেই যথেষ্ট হতে পারে না। কত দূর লেখাপড়া শিখেছিলেন নজরুলের পিতা কিংবা কৃতবিদ্য বা যোগ্য ছিলেন আরো কোন্ কোন্ বিষয়ে, তাও আমাদের অজানা। তাঁর (ফকির আহমদের) চাচাতো ভাই কাজী বজলে করিম উর্দু ও ফার্সি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। গ্রামের মধ্যে মক্তব ছিল, তার শিক্ষক মৌলভি কাজী ফজলে আহ্‌মদ আরবি ও ফার্সি ভাষা ভালো জানতেন। কাজী-বাড়ির ছবি আর গ্রামের চেহারা মাত্র এতটুকুই আমাদের জানা আছে, এর বেশি কিছু জানা যায় না। তথাপি এই স্বল্প তথ্য নিয়েই অনেকখানি পথ আমরা হাঁটতে পারি যা আমাদের অদেখা সত্যের কাছাকাছি হয়তো নিয়ে যাবে।

দুখু মিঞা নামে এই ছেলেটি বড়ো হতে-হতে তার চারপাশটাকে কেমন দেখেছিল? চুরুলিয়া কোনো বিত্তশালী গ্রাম নয়, মানি; তবু সেখানে ছিল মার্জিতরুচি শিক্ষিত একটি ভদ্রসমাজ। প্রমাণ—ছোট গ্রাম, তবু মক্তব আছে, মক্তব বসছে গাঁয়ের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্যে, সুশিক্ষিত মৌলভি আছেন, পড়ুয়াদের আনাগোনা চলছে। গ্রামে বজলে করিমের মতো লেখাপড়া-জানা মানুষও রয়েছেন। একেবারে মূর্খদের গ্রাম তো একে কোনোভাবেই বলা চলে না। অর্থাৎ চুরুলিয়া যদিও অজ পাড়া গাঁ এবং শহর থেকে অনেক দূরে এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে, তবু এই গ্রামকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলবার উপায় নেই। এক ধরনের শিক্ষা ও রুচির আলো গ্রামের মানুষজন ধরে রেখেছিল। দুঃখের সংসারে মানুষ হতে থাকলেও নজরুল এই আলোকের আভার মধ্যেই বড়ো হয়ে উঠেছিলেন।

দুখু মিঞার শৈশবের কোনো ছবি আমাদের সামনে ধরা নেই। দুখু মিঞাদের কোনো শৈশব থাকে না। গরিবের ছেলে দেশের দরিদ্র জনতার ভিড়ে হারিয়ে যায়, কে তার খোঁজ রাখে? আর যদি-বা সে দৈবাৎ কপালগুণে বিখ্যাত হয়ে যায় হঠাৎ, তা হলে তখন অবশ্য লোকে চেনে তাকে, কদর করে। কিন্তু তার ফেলে-আসা শৈশব তো তত দিনে কোথায় হারিয়ে গেছে! কবি নজরুল ইসলাম দুখু মিঞার কোনো জীবনী লেখেন নি, কোনো গল্পও কখনো রচনা করেন নি। দুখু মিঞার শৈশব কেউ আমাদের জন্যে লিখে রেখে যায় নি।

গ্রামের ছেলে। খোলামেলা মুক্ত প্রকৃতির ভিতরে বেড়ে ওঠে। দুরন্ত হওয়াটাই তার জন্যে স্বাভাবিক, জানি। তা বলে কি গাঁয়ের সব ছেলেই দুরন্ত? নজরুলের কিশোর-জীবনের ছবি আমরা চিনি : রাণীগঞ্জে পড়ছে, দুখু মিঞা এরই মধ্যে নজরুল হয়ে গেছে; তখন সে ডানপিটে বটে। কিন্তু পাঁচ বছরের দুখু মিঞা? তখনো কি সে খুব দুরন্ত? বাল্যকালে, মনে হয়, নজরুল শান্ত ছিলেন। এমন ভাববার কারণ, তাঁর ছেলেবেলার পরিবেশ। তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল ঠিক বয়সে। কে তাঁকে প্রথম অক্ষর-পরিচয় করিয়েছিলেন? সম্ভবত, বাবার কাছেই ছেলের প্রথম পাঠশিক্ষা। লেখাপড়া-জানা সব গৃহস্থ বাড়িতে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি। অক্ষরজ্ঞান হল, এক-দুই গুণতে শিখলে, তো এবারে যাও ইশকুলে। চুরুলিয়ায় স্কুল ছিল না, ছিল মক্তব। ছেলেকে মক্তবে পাঠিয়েছিলেন কাজী ফকির আহমদ। বালকের স্মৃতিশক্তি ছিল চমৎকার। মক্তবে মৌলভির কাছে কোরান পড়তে শেখা আর ফার্সি ভাষা শিক্ষার গোড়াপত্তন। কিন্তু বই মুখে নিয়ে বসে থাকলে কি গরিবের ছেলের চলে? বাড়ির টুকটাক এটা-ওটা ফাইফরমাশ খাটা আছে। বাবার পিছুপিছু মাজারে যাওয়া, হয়তো মনের আনন্দে পিদিম হাতে নিয়ে শখ মেটানো। না ডাকতেই নিজের খেয়ালখুশিতে ওজুর পানির বদনা এগিয়ে দেওয়া। ঠিকঠাক অবিকল এ রকমটাই যে ঘটত তা কে বলবে? সবটুকুই আমাদের কল্পনা। তবে এমন কল্পনার ভিত্তি আছে। দুখু মিঞাদের সংসারে এমনটাই সাধারণত হয়ে থাকে, যুগ যুগ ধরে এ রকমই হয়ে আসছে কিনা, তাই। প্রয়োজন ও অভাবের চাপ শিশুকেও অনেক কিছু বুঝতে শেখায়। নিজের ভিতরে এই বালকও তাই গোপন দায়িত্ববোধের তাড়া নিশ্চয়ই এড়াতে পারে নি। নইলে অকস্মাৎ বাপ মারা গেল যখন, তখন দুখুর বয়েস তো সবে আট। অথচ মাত্র দু' বছরের ভিতরেই দশম বর্ষীয় এই কিশোর তার পরিবারের এক জন দায়িত্ববান সদস্য হয় কোন্ মন্ত্রবলে? সে-কারণেই বলছিলুম, পরবর্তী জীবনের বেপরোয়া উদ্দাম নজরুল ডানপিটে হওয়ার কোনো অবকাশ পায় নি দুখুর বয়েসে।

মক্তবে তো ছেলে যাচ্ছে পাততাড়ি বগলে নিয়ে, কিন্তু পড়ছে কী? মক্তবে পড়ানো হত আরবি–ফার্সি। তবে ভাষাশিক্ষা ততটা নয় যতটা ধর্মশিক্ষা। মাতৃভাষা বাংলা অবশ্য বাদ পড়ত না। বাবার চাচাতো ভাই কাজী বজলে করিম ফার্সি ও উর্দু জানতেন চমৎকার, বাংলাতেও ভালো দখল ছিল। তদুপরি কবিতাপাগল মানুষ। চাচা–ভাইপোর সম্পর্ক মধুর ছিল। শিশুর মনে ভাষার প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে দিয়েছিলেন এই পিতৃব্য। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বাবা কাজী ফকির আহমদ মারা গেলেন। তারিখ ১৩১৪ সালের ৭ই চৈত্র। সংসার চলে না, বাবা নেই, দারিদ্র্য বাড়ছে। এক বৎসর পর মক্তব থেকে নিম্ন–প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল দুখু। ব্যস্, সঙ্গতি শেষ, লেখাপড়াও খতম। গরিবের ছেলের বেশি লেখাপড়ার দরকার কী? এতটুকুই যথেষ্ট! এখন যা প্রয়োজন তা হল উপার্জন, পয়সা উপায় করা। যেখান থেকে দু'-চার পয়সা মেলে সেখানেই দৌড়ানো; সংসারের ওটুকুই লাভ। দশ বছর বয়সে ধনীর দুলালেরা যখন পৃথিবী কাকে বলে জানে না, সেই বয়সেই দুখুকে ঘরের ভাবনা ভাবতে হয়। ঐ তো একরত্তি ছেলে! ছুটবেই আর কোথায়? ঐ মক্তবেই বরং একটা চাকরি করে দাও। তাই হল। সেইসঙ্গে পিতার শূন্যস্থান পূরণ—মাজারের খাদেমগিরি আর মসজিদের ইমামতি। বাচ্চা মোল্লা হিসেবে দুখ মিঞা মানিয়ে গেল বেশ। উপায়–উপার্জন একটু–আধটু হতে লাগল বৈকি।

নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার–অনুষ্ঠান রপ্ত করতে–করতে, নিজের সমাজকে দেখতে–দেখতে জানতে–জানতে ছেলেটি বড়ো হয়।

৩

চাচা বজলে করিম ছিলেন রসিক মানুষ, আগেই বলেছি। তিনি যে কেবল উর্দু–ফার্সি ভালো জানতেন, তাই নয়। নিজে কবিতা লেখার চেষ্টাও করতেন। ফার্সি বা উর্দুতে নয়, মাতৃভাষা বাংলায়। তাঁর একটি 'লেটো'র দল ছিল, সে–জন্যেই লেখা। আর এসব গানের, কবিতার, ভাষা কী? গাঁয়ের লোকের কাছে বড়ো কদর ঐ সব রচনার। কাব্যরসিক এই ব্যক্তি বালক ভ্রাতুষ্পুত্রটির মনে উভয়েরই অলক্ষ্যে স্বপ্নের বীজ বুনে দিতে লাগলেন। এই বীজ থেকেই একদিন মহীরুহ হবে। ফুলে-ফলে ভরে উঠবে তার শাখা–প্রশাখা। পদ্য রচনায় দুখু মিঞার হাতেখড়ি হল এঁর কাছেই। শুরু হল মুখে মুখে পদ্য বানানো। অদ্ভুত তার ভাষা। আরবি, ফার্সি, বাংলা, ইংরেজি মিশিয়ে।

ভালো কথা, পুঁথি পড়েছ তোমরা? কিংবা সুরেলা গলায় সুর করে কাউকে পুঁথি পড়তে শুনেছ কখনো? বাঙালি মুসলমান সমাজে গ্রামে–গঞ্জে শহরে–হাটবাজারে পুঁথি পড়া আর শোনার খুব প্রচলন ছিল সেকালে। আজকাল শহর থেকে সেই চল প্রায় উঠে গেছে, তবে গ্রামে–গঞ্জে এখনো তুমি তা শুনতে পাবে। দিনের শেষে কাজকর্ম সব সারা, সন্ধেয় খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে লোকগুলো এসে জড়ো হচ্ছে এক জায়গায়, গোল হয়ে সবাই বসে পড়ছে, মধ্যিখানে জ্বলছে হারিকেন, আর তারই আলোয় বটতলায় ছাপানো একটা পুঁথি হেলেদুলে সুর করে পড়ে যাচ্ছে একটা লোক : সোনাভানের কেচ্ছা, কি আমির

হামজার পুঁথি। আর সমবেত শ্রোতারা কি মন দিয়েই না তা শুনছে! তা নাহয় হল, কিন্তু এইসব পুঁথির ভাষা কেমন? না শুনলে তো বুঝবে না, তাই একটু শোনা যাক :

যতদূর আছে তাঁর কবিতার হার।
দেখিয়া শুনিয়া লোকে হয় জারেজার ॥
কেচ্ছার পহেলা আধা শুনিয়া আলম।
আখেরী কেচ্ছার তরে করে বড়া গম ॥
না পারিনু এড়াইতে লোকের খাহেশ।
গাঁথিনু কবিতা আমি ভাবিয়া বিশেষ ॥
বিদ্যাবুদ্ধিহীন আমি যাহা কিছু জানি।
গাঁথিনু কবিতা আমি আখেরী কাহিনী ॥

এরকম হচ্ছে পুঁথির ভাষা। আরবি, ফার্সি, হিন্দি, উর্দু, তুর্কি প্রভৃতি শব্দ মিলেমিশে গেছে বাংলার সঙ্গে। সাহিত্যে এমন ভাষার একটা নাম আছে, বলা হয় 'মিশ্ররীতির ভাষা' বা 'মিশ্রভাষা রীতি'।

দুখু মিঞা কি আর এসব পুঁথি কম শুনেছে? কানে ছন্দ আর সুরের মাতন লেগে থাকে, অজানা-অচেনা নতুন নতুন শব্দ আকর্ষণ করে—তার মানে কিছু বোঝা যায়, কিছু যায় না। চাচা বজলে করিমেরও আছে এমনি পাগলামো। কবিতা আর গানের নেশা। পুঁথিপাঠের সান্ধ্য আসর তাঁর উঠোনেই বসত কিনা কে বলবে? পিতৃব্যের প্রশ্রয়েই কিনা কে জানে, দুখু মিঞাও লিখে ফেলল এক দিন :

মেরা দিল্ বেতাব্ কিয়া তেরী আব্রুয়ে কামান;
জ্বলা যাতা হ্যায় ইশ্‌ক্-মে জান পেরেশান।
হেরে তোমায় ধনি
চন্দ্র কলঙ্কিনী
মরি কী যে বদনের শোভা, মাতোয়ারা প্রাণ।
বুলবুল করতে এসেছে তাই মধু পান ॥

কেমন লাগল শুনতে? মনে হচ্ছে না ঠিক যেন পুঁথির ভাষা? ভিনদেশী শব্দগুলো কী সুন্দর বাংলার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে! মিশ্রভাষা রীতিতে কিন্তু ইংরেজি শব্দ বড়ো একটা থাকত না। দুখু মিঞা এক দিন ইংরেজি মিশিয়েও পদ্য লিখে বসল :

ওরে ছড়াদার, ওহে দ্যাট [that] পাল্লাদার
মস্ত বড় ম্যাড [mad];
চেহারাটাও মাংকি লাইক [monkey like]
দেখতে ভেরি ক্যাড্ [cad],
লড়বে বাবর্-কা সাথ্
ইয়ে বড় তাজ্জব বাত্,
জানে না ও ছোট্ট হলেও
হাম্‌ভি লায়ন ল্যাড্ [lion lad],

আরো একটা কবিতা :

রব না কৈলাসপুরে
আই অ্যাম ক্যালকাটা গোইং।

যত সব ইংলিস ফেসেন,
আহা মরি, কি লাইটনিং ॥
ইংলিস ফেসেন সবি তার
মরি কি সুন্দর বাহার!
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার
কামন ডিয়ার গুড মর্নিং ॥

ঠিক এ-ধাঁচের পদ্যে দুখু মিঞার পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও লিখতেন এক জন; এই রকমই অনেক ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে বাংলা কবিতা। ভদ্রলোক কবি ছিলেন, সাংবাদিক ছিলেন। নাম ঈশ্চরচন্দ্র গুপ্ত, লোকে বলতো 'গুপ্ত কবি'। নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। তাঁর সময়ের খুব বড়ো কবি। মনে পড়ছে না ঐ সব কবিতা : তপসে মাছ, আনারস, শীত, স্বদেশ? ইংরেজি নববর্ষ অর্থাৎ পয়লা জানুয়ারিকে উপলক্ষ করে তাঁর লেখা চমৎকার একটা কবিতা শোনো তা হলে। এখানে ইংরেজি শব্দের কী নিপুণ ব্যবহার!

নববর্ষ মহা হর্ষ ইংরাজ টোলায়।
দেখে আসি ওরে মন আয় আয় আয় ॥
শিবের কৈলাসধাম আছে কতদূর।
কোথায় অমরাবতী কোথা স্বর্গপুর ॥
সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরি নানা।
ধরিয়াছে টেবিলেতে অপরূপ খানা ॥
বেরিবেষ্ট সেরিটেষ্ট মেরিয়েষ্ট যাতে।
আগে আগে দেন গিয়া শ্রীমতির হাতে ॥
হিপ্ হিপ্ হুর্ রে ডাকে হোল ক্লাস।
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক দিস্ গ্লাস ॥ ...
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক্।
যত পার ক'সে খাও টেক্ টেক্ টেক্ ॥

দুখু মিঞা কি তা হলে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পড়ত? তার বাড়িতে কোনো ঘরের কুলুঙ্গিতে ছিল কি কোনো বই গুপ্ত কবির? কিংবা করিম চাচার বাড়িতে? থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। জানবার তো কোনো উপায় নেই। তবে, মনে রাখতে হবে, তখন যুগের আবহাওয়াটাই ছিল ঐ রকম।

কী রকম? সেই কথাই বলি।

সেকালে গ্রামাঞ্চলে লোকে অবসর সময় কাটাত যাত্রা দেখে, পাঁচালি আর কবিগান শুনে। জীবন তো আর এখনকার মতো ব্যস্ত ছিল না। ক্ষেতখামারের কাজ করে ঘর-গেরস্থালির ভাবনা ভাববার পরে লোকের হাতে সময় জমা থাকত। এই অবসর সময় সে কাটাবে কী করে? অমুক গ্রামে যাত্রা হচ্ছে,—চল না, দেখে আসি। অথবা হয়তো যাত্রা নয়, কবিগান, নয়তো ঝুমুর নাচ, কিংবা এ-ধরনেরই কিছু একটা। সুয্যি ডোবার পরপরই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে যায়। গরমের দিনে সমুদ্দুরের মতো রাত! কাটানো কি চাট্টিখানি কথা? ঘুমের চেয়ে অনেক ভালো—হৈ-হৈ করে দল বেঁধে মাইলের পর মাইল রাস্তা ভেঙে ভিনগাঁয়ে পৌঁছুনো। ভোরবেলায় আসর ভাঙলে তবে বাড়ি ফেরা। আর যদি নিজের গ্রামেই আসর বসে? তা হলে আর পায় কে? একেবারে পোয়াবারো!

যারা মুখে মুখে ছড়া বানাত, গান বাঁধতে পারত, তাদের খুব কদর ছিল গ্রামে, সারা গাঁয়ের গর্বের ধন। এ ধরনের গ্রাম্য কবিদের নিয়ে পাঁচালি-পালা, কবিগানের দল বাঁধা হত। গলায় সুর থাকা চাই, হার্মোনিয়াম বাজাতে জানা চাই, চাই ঢোল–তবলা খোল–করতাল কি 'ফুলোট' বাঁশি বাজানোর দক্ষতা। সেইসঙ্গে আরও চাই বিধিদত্ত ক্ষমতা : মুখে মুখে কথার পিঠেপিঠে কথা বসানো, ছন্দে ছন্দে। এক জনের ভিতরেই যে সব গুণ থাকবে এমন নয়! তা হলে আর দল তৈরির দরকার কী? একাই তো একশো! তবে, হ্যাঁ—প্রত্যেকেরই একাধিক বিষয় না জানলে চলত না। যে গান বাঁধছে সে হয়তো জানে বাঁশি বাজাতে, হার্মোনিয়াম ধরতে। যে তবলায় চাঁটি দেয় সে হয়তো জানে অভিনয় করতে, অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে। এই রকম আর কি! তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা বই আছে, 'কবি'। তারাশঙ্করকে চিনতে পারছ? এ যুগের খুব বড়ো ঔপন্যাসিক–প্রতিভা। হাতের কাছে পেলে বইটি পড়ে ফেলো। কবিগান–কবিয়ালদের নিয়েই এই উপন্যাস। গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া একটা যুগ ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পাবে চোখের সামনে। দুখু মিঞা যখন ছোট, অখণ্ড সেই বাংলা দেশে ঐ যুগটাই চলছিল তখন।

কবিগানেরই একটা ধরন ছিল 'লেটো' গান। 'লেটো' নাচ বললেও ভুল হবে না। কয়লাকুঠির দেশে, অর্থাৎ আসানসোল–রাণীগঞ্জ অঞ্চলে, এর খুব প্রচলন ছিল। লেটো গান বা নাচ শুধুই গান বা নাচ নয়, বরং দুটোই একসঙ্গে। নাচ–গান পৃথক দুটো ভাগ নয়; গাইতে গাইতে নাচ, কিংবা নাচের তালে–ছন্দে গান গাইতে থাকা। এরই সঙ্গে মিশেছে আবার যাত্রাভিনয়ের কিছু ঢং–ঢাং। আসর কিন্তু মূলত গান বা নাচের নয়, গল্পের। একটা গল্প বলা হত গানে গানে, নেচে নেচে, অভিনয় করে করে। একই আসরে দুটো দল বসেছে। একে অন্যের প্রতিপক্ষ। শুরু হবে তখন কথার লড়াই, কে কাকে হারাতে পারে! সেই কথাও কিন্তু সাদামাটা বর্ণহীন নীরস কথা বলা নয়; গানের সুরের ভিতর দিয়ে বলা। আসলে কবিগান আর যাত্রা এতে মিলেমিশে একাকার।

বালক দুখু মিঞা লেটো গানই কি কম শুনেছে? অনেক রাতই হয়তো পার করে দিয়েছে আসরে বসে। আনন্দে মন ভরে গেছে গান শুনতে–শুনতে, নাচ–অভিনয় দেখতে–দেখতে। মাথার মধ্যে ভাবের তরঙ্গ খেলা করে গেছে। ছেলেখেলার মতোই মুখে মুখে গান আর ছড়া বানিয়েছে কিশোর কবি। বাঃ, আমাদের দুখু মিঞা দেখছি গান আর ছড়া বানাতে পারে! পাড়াপড়শির চোখে প্রশংসা ঝিক্‌মিক্‌ করে ওঠে। কাজী ফকিরের ছেলে দুখু মিঞা, বজলে করিমের ভাইপো দুখু মিঞা রাতারাতি ক্ষুদে কবি ব'নে যায়। গ্রাম্য কবি।

ছড়াই যখন কাটতে পার বাছা, একটা লেটোর দলে ঢুকে যাও না। আদরে সস্নেহে কেউ কি আর বলে নি? ঘরেতে ভাত–কাপড়ের সমস্যা, খাদেমগিরি–ইমামতিতে ক'টা পয়সাই–বা আর আসে! লেটোর দলে ঢুকলে ওরাও কি আর দু'-চার গণ্ডা পয়সা না দেবে? যাই দিক, সেটাই তখন উপরি আয়। এ ধরনের যুক্তি সাজিয়ে কেউ কি বুঝিয়েছিল দুখুকে? আমরা কী করে বলব? বড়ো হয়ে দুখু এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করে নি। তবে, আমরা জানি—কেউ না বললেও উপদেশ তৈরি হয় মগজের ভিতরে। অভাবের দুশ্চিন্তা যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে উপদেশমালা নিরন্তর তৈরি করে চলে।

চুরুলিয়া ও তার আশপাশের গ্রামগুলোয় দু–তিনটে নামকরা লেটোর দল ছিল। একটা তো ছিল চাচা বজলে করিমেরই। তাদের চোখ পড়ল দুখুর ওপর। গান লেখো না

আমাদের জন্যে। পারলে পালাগানও লেখো। একেবারে বিনি পয়সায় নয়, যা পারি কিছু দেব। নিমশাহ, চুরুলিয়া আর রাখাখুড়া—এই তিন গাঁয়ের তিন লেটো দলই দলে টানতে চায় দুখুকে। ভাব হয়ে গেল সবার সঙ্গে। তের-চোদ্দ বছরের কিশোর কবি একজন : সমুদয় ইন্দ্রিয় ও অনুভব কৌতূহলে সজাগ হয়ে আছে সর্বক্ষণ, সারা পৃথিবী নিজের ভিতরে শুষে নেবে বলে। গান? লিখে দিচ্ছি। ছড়া? কবিতা? ঠিক আছে, বানিয়ে দিচ্ছি। আর পালাগান? দেখি না চেষ্টা করে পারি কিনা। লেখা চলল। পালাও লেখা হল। লেটোর দলের সঙ্গে মিশে গেল দুখু। খুব ভালো লাগছে। এ এক নতুন জগৎ। অভিনয়, নাচ, গান! সবাই চেনা মুখ, তবু এরাই রাতে আসরে নেমে কী অপরূপ হয়ে যায়! একেবারে রূপকথা যেন। আলাপ হয় পালাগানের কাহিনী নিয়ে, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প নিয়ে, পুরাণের দেব-দেবীর অলৌকিক মহিমা নিয়ে। কত বন্ধু জোটে নিত্যনতুন। মুসলমান-হিন্দু—কিছুরই বাছবিচার নেই : সবাই আমরা আল্লার বান্দা, মায়ের সন্তান। মানুষের পরিচয় একটাই—সে মানুষ। ছোঁয়াছুঁয়ি জাতপাত—এসব আবার কী? মনুষ্যত্ব থাকল তো তুমি মানুষ; আর ওর বিহনে তুমি যে জাতেরই হও-না কেন, তুমি তো আর মানুষ নও। তা ছাড়া ভালোবাসার কি কোনো জাতবিচার আছে? দুখুর বন্ধু সকলেই। ধর্ম বাধা নয়, জাত বাধা নয়, সম্প্রদায় বাধা নয়। লেটোর দলে গান লেখে দুখু, পালা লিখে দেয়। দলের সঙ্গে মাঝেমধ্যে ঘুরতে হয় এ-গ্রাম সে-গ্রাম। দূরের নয়, আশপাশেরই চৌহদ্দিতে। ঘুরতে-ঘুরতে জানা হয়ে যায় মানুষজন, তাদের সুখদুঃখের কথা। অবাক বিস্ময়ে বুঝতে চেষ্টা করে জটিল পৃথিবীর রহস্য : ধনী, দরিদ্র, সমাজ ও তার নিয়ম-কানুন। নিজে সে মুসলমান বটে, তবু হিন্দু বন্ধু তার কম নেই। তাদের ঘরেও নিত্য যাওয়া-আসা। পালপার্বণ, পুজো, উৎসব দেখতে-দেখতে হিন্দু সমাজও তার জানা হয়ে যায়। বাংলাদেশের সমাজ মূলত হিন্দু আর মুসলমানদের নিয়েই, এবং উভয় সম্প্রদায়ই গরিব। এদের ভিতরেই চলতে-ফিরতে গিয়ে অনভিজ্ঞ কিশোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, নিজের অগোচরে গোটা সমাজটাকে সে জেনে ফেলে। এই জানা পরে বড়ো কাজে লেগেছিল দুখুর।

লেটোর দলে ঢুকে পড়ায় তার সংসারের দিক থেকে লাভ যেটা হয়েছিল তা আর্থিক। বড়ো ভাই কাজী সাহেবজান কষ্টেসৃষ্টে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে কয়লাখনিতে। বাবা যখন মারা যায় তখন তার বয়সই-বা আর কত? বড়ো জোর তের-চোদ্দ। তখনই সে ঢুকে পড়েছে ঐ চাকরিতে; মাইনে যৎসামান্য, তবু অভাবের চাপে ভেঙে-পড়া পরিবারটিকে কোনো রকমে খাড়া রাখবার জন্যে সেটুকুও বিধাতার দান মনে হয়। লেটোর দল থেকে যে ক'পয়সা আয় হয় দুখুর তাও চলে যায় সংসারের পেটে। দু' ভাইয়ের আয় জোড়াতালি দিয়েই তবে মা-ভাই-বোনের মুখে অন্ন জোটে।

ক্ষুদে কবি হিসেবে চারপাশের গাঁ-গেরামে দুখুর খুব সুনাম হয়েছিল। কম লেখা তো সে আর লেখে নি। চাষার সং, শকুনি বধ, মেঘনাদ বধ, দাতা কর্ণ—এমনি সব পালা; তার ওপরে আছে আবার নানান জাতের নানান ধাঁচের কবিগান। তবে, নিমশাহ গ্রামের যে লেটো দল ছিল তাতেই সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল সবচেয়ে বেশি। দলের ওস্তাদ তাকে আসন দিত যোগ্য সাগরেদের, সে হয়ে উঠেছিল অন্যদের চোখে এক ক্ষুদে ওস্তাদ। দুখু যখন দল ছেড়ে দিয়ে চলে যায় তখন মুষড়ে পড়েছিল সবাই, গান বেঁধেছিল তাকে নিয়ে :

আমরা এই অধীন
হয়েছি ওস্তাদহীন
ভাবি তাই নিশিদিন,
বিষাদ মনে।
নামেতে নজরুল ইসলাম,
কি দিব গুণের প্রমাণ!

কয়লাকুঠির দেশে সেদিন এক বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন। তাঁর নাম শেখ চকোর। কিন্তু সবাই ডাকত 'গোদা কবি' বলে। লেটো দলের এই কিশোর কবির গুণে তিনি মুগ্ধ ছিলেন, আদর করে কখনোসখনো বলতেন 'ব্যাঙাচি'। শোনা যায়, একবার তিনি বলেছিলেন : "এই ব্যাঙাচি বড়ো হয়ে সাপ হবে।" মানে—এখন যাকে নেহাৎ সাধারণ ও সামান্য মনে করে অবহেলা করছ ভবিষ্যতে সে-ই হয়ে উঠবে উল্লেখযোগ্য, অসামান্য, অপ্রতিরোধ্য।

ভাগ্যলিপি যার এক দিন দেশবরেণ্য কবি হওয়া, শৈশব-কৈশোর তাকে এমনি ভাবেই দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে সেই সিংহদরজার পানে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

৪

লেটো দলের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক একদিন চুকল। সময়ের হিসেব করলে এই সম্ভ্রব বেশি দিনের তো নয়—বড়ো জোর দেড় কি দু' বছর। তবু যেখানে এত আদরের পাত্র, পয়সাকড়িও ঘরে আসছে যে-সবের জন্যে, তা কেন ছেড়ে দেয় দুখু? বড়ো হয়ে বিখ্যাত হয়ে একবার একটা চিঠিতে কথাপ্রসঙ্গে সে বন্ধু পবিত্রকে লিখেছিল : "চুরুলিয়ার লেটোর দলের গান-লিখিয়ে ছোকরা নজরুলকে কে-ই বা কানাকড়ি দাম দিয়েছে!" কানাকড়ি দাম দিক, না-দিক, ঘরেতে তো কড়ি আসছিল এবং তখন পরিবারের জন্যে সেটাই সবচেয়ে জরুরি। তা হলে লেটোর দল সে ছাড়ে কোন বুদ্ধিতে?

ছেলেটা মেধাবী, পড়াশুনোয় ঝোঁক আছে, বয়েসও আছে শেখবার, অথচ অবস্থার বিপাকে লেখাপড়া হবে না? দুখুর জন্যে হয়তো গর্ব ছিল অন্যদের মনে, তবে দুঃখও মিশে ছিল তার সাথে। কথায় আছে, কাজী বাড়ির বিড়ালও নাকি খানিক লিখতে-পড়তে জানে। আর, কাজী ফকিরের কোনো ছেলেই কি লেখাপড়ার সুযোগ পাবে না? গ্রামে শুভানুধ্যায়ীরাই চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন—পয়সা কামানোর চিন্তা ছেড়েছুড়ে ইশকুলেই যাক দুখু, ফের পড়াশুনোটা শুরু করুক। কাশিমবাজারের মহারাজাদের একটা স্কুল আছে মাথরুনে। পড়ানোর খরচ তেমন লাগে না, তাই সেখানে ভর্তি করানোই ভালো। মাথরুন গ্রামের নাম। বর্ধমান জেলাতেই মঙ্গলকোট থানার একটা গ্রাম। অজয় নদের পাড়ে। স্কুলের আসল নাম নবীনচন্দ্র ইন্সটিট্যুট, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী স্থাপন করেছিলেন। গাঁয়ের লোকজন এত লম্বা নাম বলতে চাইত না, 'মাথরুন স্কুল' নামটাই চালু হয়ে গিয়েছিল। যাক, সেখানেই অবশেষে কাজী নজরুল ইসলাম নামের শ্যামলা রঙের

একটি ছেলে এসে ভর্তি হল। ক্লাস সিক্সে। সে-আমলে 'সিক্স' বলত না, বলত ফিফ্‌থ্ ক্লাস; সবচেয়ে উঁচু দশম শ্রেণীকে কেউ ক্লাস টেন বলত না, বলত ফার্স্ট ক্লাস। সময়টা সম্ভবত ১৯১১ সাল। এই স্কুলে বড়ো জোর বছরখানেক কেটেছিল। হেডমাষ্টার ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। এঁর কবিতা তোমরা পড়েছ কিনা, জানি না; তবে আমাদের ছোটবেলায় আমরা পড়েছি প্রচুর। পাঠ্যবইয়ে এঁর কবিতা অনিবার্যভাবে থাকত। যাক সে কথা। নজরুলের ছাত্রজীবনের এক টুকরো ছবি তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। সেই ছবি আমাদের জানা দরকার। তিনি লিখেছেন :

> আমি তেইশ বৎসর বয়সে মাথরুন উচ্চ ইংরাজী স্কুলে শিক্ষক হিসাবে ঢুকি।...নজরুল কলিকাতায় আমাকে জানায় যে, সে আমার স্কুলের ছাত্র এবং ভক্তিভরে প্রণাম করে।
>
> আমি শুনিয়া আনন্দিত হই ও গৌরব বোধ করি। তখনকার দিনে 6th Class-এ নজরুল পড়িত। ছোট্ট সুন্দর ছনছনে ছেলেটি, আমি ক্লাস পরিদর্শন করিতে গেলে সে আগেই আসিয়া প্রণাম করিত। আমি হাসিয়া তাহাকে আদর করিতাম।
>
> সে বড় লাজুক ছিল, হেডমাষ্টারকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত দেখিত। ছোট ছেলে কাছে আসিতে সাহসী হইত না, সে নিজেই আমাকে এ কথা বলিয়াছে।
>
> শিশুকালেই তাহার ব্যবহার ও কথা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্লাসের ছেলেরাও সকলে তাহাকে ভালবাসিত।
>
> সে স্কুলে বেশীদিন ছিল না। বোধহয় 4th Class (Class VII)-এ উঠার আগে কি পরে অন্যত্র যায়।

মাথরুন স্কুল ছাড়তে হয়েছিল মনে হয় পয়সাকড়ির কারণেই।

অর্থের অভাবই যদি পড়াশুনো বন্ধের কারণ হয়, তা হলে উপার্জনের চিন্তা মনে না এসেই পারে না। পুরোনো লেটোর দল দুখুকে নতুন করে দলে টানতে চেয়েছিল কিনা জানা নেই। তবে এটা ঠিক যে সে আর পুরোনো বৃত্তে ফিরে যায় নি। পড়াশুনো নেই, উপার্জনের জন্যে কোনো কর্মে নিয়োজিতও নয়, সময়টা তবে কাটছে কী করে? সময় কাটছিল সম্ভবত চাকরির ধান্ধায়। তার মানে, যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো। যদি-বা কোনোখানে একটা কাজ জোগাড় হয়ে যায়, তার আশায়। এক কথায়, ভবঘুরে জীবন। এই সময়ের কাহিনীও দুখু বড়ো হয়ে কোথাও লেখে নি। লেখে নি বটে, কিন্তু গল্প করেছিল, বলেছিল পরানের বন্ধু শৈলকে। শৈল কে? শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে সাড়া-জাগানো তোলপাড়-করা কথাশিল্পী। খুব বেশি বই লেখেন নি, কিন্তু যাই লিখেছেন তাই চমৎকার। পরে অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্র ছেড়ে চলচ্চিত্রজগতে চলে যান। যদি এঁর কোনো বই অথবা কোনোখানে এঁর কোনো গল্প চোখে পড়ে, তা হলে তা পড়তেই চাও। ছোটবেলাকার বন্ধু নজরুলকে নিয়েও দুটো বই লিখেছেন। অনবদ্য বই : "কেউ ভোলে না কেউ ভোলে" আর "আমার বন্ধু নজরুল"। অন্য বন্ধুদের বলতেন : "ও যে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আর সবাই ডাকবে আমাকে শৈলজা বলে, ও ডাকবে শৈল বলে।" এমনই ঘনিষ্ঠতা, এমনই সখ্য। সারা জীবন অটুট ছিল। শৈলকে যে-গল্প দুখু বলেছিল তা লেখা আছে "কেউ ভোলে না কেউ ভোলে" বইয়ের ভিতরে। মাথরুন স্কুল ছাড়ার পর কী করে চাকরি জুটেছিল, এই গল্প সেই গল্প :

> ...ব্রাঞ্চ লাইনের গার্ড সাহেব, গাড়ি নিয়ে ডিউটিতে বেরিয়েছেন। শীতকালের রাত্রি। গাড়ি দাঁড়ালো গিয়ে একটা স্টেশনে। কয়লাকুঠির দেশ। কয়লা-ভর্তি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সাইডিং-লাইনের ওপর। সেগুলো টেনে এনে জুড়তে হবে গাড়ির সঙ্গে। তারপর গাড়ি ছাড়বে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে চুপচাপ।

লাইনের ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা আম-কাঁঠালের বাগান। সেই বাগানেই একটা গাছের নিচে চট বিছিয়ে কতকগুলো লোক গানের আসর জমিয়েছে। হারমোনিয়াম বাজছে, ঢোল বাজছে, ঝুমুরের সুরে কবিগান হচ্ছে। মন্দ লাগছে না শুনতে। গার্ড সাহেব তাঁর কামরা থেকে নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সেইদিকে।

গোটাকতক লণ্ঠন জ্বলছে টিম টিম করে, আর দু'দিকে দুটো কাঁচা কয়লার গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একটা অর্জুন গাছে হেলান দিয়ে গার্ড সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছেন। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলেন। দেখলেন, দলের মাঝখানে বসে জোয়ান যে-ছেলেটি ঢোলক বাজিয়ে গান গাইছে, তারই কৃতিত্ব যেন সবচেয়ে বেশি। মাথায় ছোট ছোট চুল, গায়ে একটা হাত-কাটা জামা, পরনে খাটো ধুতি। হাসি যেন মুখে তার লেগেই আছে।

দুটো গান শেষ হলো। ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো। বললে, চললাম।

সবাই তাকে ধরে বসলো, আর-একটু থাকো। ছেলেটি থাকলো না। পেরিয়ে যাচ্ছিল গার্ড-সাহেবের পাশ দিয়ে। গার্ড সাহেব তার হাতটা চেপে ধরলেন। ছেলেটি হকচকিয়ে থমকে থামলো। মাথাটা একটু দুলিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো শুধু। সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বড় বড় ঢলঢলে চোখ, চওড়া বুকের ছাতি! দেখে মনে হলো ছেলেটি রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সাহেব-ভীতি থাকা তখনকার দিনে স্বাভাবিক। যদিও গার্ড-সাহেবের গায়ের রং দেখলে সাহেব-সাহেব মনে হয় না।

সাহেব বললেন, তুমি এ-দলের নও তাহলে?

—না।

—কি নাম তোমার?

—দুখু মিঞা, ভাল নাম— নজরুল ইসলাম।

—মুসলমান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাহেব তার বুকে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন, বাঃ!

বাসুদেব হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে ব্যাপারটা। দুখুকে সাহেবে ধরেছে। মানুষকে বাঘে ধরলেও মানুষ বোধহয় এত বিচলিত হয় না! ধড়মড় করে আসর ছেড়ে ছুটে এলো বুড়ো বাসুদেব। সাহেবের কাছে এসে হাতজোড় করে বললে, দল আমার হুজুর, ও শুধু গান লেখে, পালা লেখে, আর সুর দিয়ে দেয়। যা বলতে হয় আমাকে বলুন। আমরা তো রেলের বাউণ্ডারী ছেড়ে দূরে বসেছি হুজুর।

বাসুদেব ভেবেছিল বুঝি কোনও বে-আইনী কাজ তারা করে ফেলেছে, যার জন্য সাহেব ধরেছে দুখু মিঞাকে।

সাহেবের বেশ মজা লাগলো। বললেন, তা গাঁ ছেড়ে এসে এখানে আসর বসালে কেন?

বাসুদেব বললে, গাঁয়ের ছোঁড়াগুলো ভারি গোলমাল করে হুজুর। আর এ-জায়গাটা বেশ নিরিবিলি।...দু'-দুটো বায়না, মহড়া না দিলেই নয়। তাই নিরিবিলি এইখানে এসে বসেছি হুজুর। আপনি একটু হুকুম দিয়ে দিন। আজকের দিনটা আর কালকের দিনটা। ব্যস্ তারপর আমরা জায়গা দেখে নেবো।

রেল-লাইন ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে বাগানে বসে গান গাইছে তারা। হুকুমের দরকার হয় না। তবু গার্ড-সাহেব বললেন, আচ্ছা যাও, হুকুম দিলাম। কিন্তু তুমি এসো আমার সঙ্গে।

এই-না বলে নজরুলকে নিয়ে গার্ড সাহেব তাঁর ট্রেনের কামরায় এসে উঠলেন। বললেন, এই যে তুমি ওদের কাজ করে দাও এর জন্যে ওরা তোমাকে কি দেয়?

নজরুলের মুখে আবার সেই হাসি।—দেবে আবার কি? শখের দল তো!

—তোমার বাড়ির অবস্থা বুঝি খুব ভাল!

মাথা হেঁট করে ঘাড় নেড়ে নজরুল বললে, না।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কাজকর্ম কিছু করবে?

নজরুল বললে, পেলে তো করি। দিন-না একটা!

সাহেব বললেন, আমার সঙ্গে থাকতে হবে।

—থাকবো।

—গান শোনাতে হবে।

—শোনাব।

ব্যস্। সেইদিনই কাজ পেয়ে গেল নজরুল। রাত্রে বাড়ি পর্যন্ত গেল না। বাসুদেবকে বলে দিলে, মাকে বলে দিও, আমি একটা কাজ পেয়েছি।

চমৎকার কাজ। রেল-স্টেশন থেকে প্রসাদপুরের বাংলো মাত্র মাইল-দেড়েক পথ। এই দেড় মাইল কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে গার্ড সাহেবকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। এই হলো প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ—টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার ভর্তি করে প্রসাদপুর থেকে নিয়ে আসা। তৃতীয় কাজ—এক দিন অন্তর ট্রেনে চড়ে আসানসোল যাওয়া আর সেখান থেকে বিলিতি মদ কিনে আনা।

সাহেবের বাড়িতে খারাপ ছিল না দুখু। তবে এই চাকরিও কয়েক মাসের বেশি স্থায়ী হয় নি। সে এক লম্বা কাহিনী। শৈলজানন্দ তাঁর বইয়ে সবটুকুই লিখেছেন। এখানে কেবল সংক্ষেপে এইটুকু বলি, কর্মে অবহেলা বা কোনো অপরাধের জন্য তার চাকরি যায় নি। সাহেবের একান্ত পারিবারিক ও ব্যক্তিগত এক জটিল পরিস্থিতিই এর জন্যে দায়ী ছিল। এ-চাকরির উপসংহার এরকম :

... সাহেবের কি মনে হলো কে জানে, পরের দিন সকালে চায়ের পেয়ালাটি হাতে নিয়েই ডাকলে, দুখু!

নজরুল এসে দাঁড়াতেই বললেন, দিন কতকের জন্যে তুমি গা-ঢাকা দিতে পারো?

—পারি।

সাহেব বললেন, তাহলে আজই তুমি খেয়েদেয়ে চলে যাও।

এই বলে পঞ্চাশটি টাকা তিনি তার হাতে গুঁজে দিলেন।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে নজরুল বললে, এত কেন?

সাহেব বললেন, এত নয়। পঁচিশ টাকা হিসেবে তোমার দু' মাসের মাইনে।

নজরুলের চাকরি এইখানেই খতম!

সেই যে সে গা-ঢাকা দিয়েছিল, জীবনে আর কোনোদিনই সে প্রসাদপুরের বাংলোয় ফিরে যায় নি।

৫

সাহেব গার্ডের বাসায় চাকরি করার ফলে অন্তত একটা লাভ হয়েছিল। গ্রামীণ সমাজের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল দুখু। মফঃস্বল শহর, কলকারখানা, নানা ধরনে পেশা, নানা জাতের লোক—এসব তো সে জানতেই পারত না চুরুলিয়া থেকে বেরিয়ে না এলে।

কাছেপিঠে সবচেয়ে বড়ো জায়গা আসানসোল। বর্ধমান জেলার মহকুমা সদর। সাহেবের ফরমাসে এক দিন অন্তর এখানে আসতেই হয়। কয়লাখনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই শহর। হদ্দ পাড়াগাঁর একটা ছেলের শহর দেখে ভড়কে যাবার কথা। অত আগে অবশ্য আসানসোল আহামরি কিছু শহর ছিল না—না আয়তনে, না বৈচিত্র্যে। তবু শহর তো! শহরের চালচলনই আলাদা, গ্রাম থেকে; তা সে যেমন শহরই হোক। অথচ দুখুকে বাধ্য হয়েই এখানে যাওয়া-আসা করতে হয়েছে। আসানসোলের সঙ্গে অপরিচয়ের ব্যবধান ঘুচে গেল এমনি করে। রাস্তাঘাট চেনা হল, দোকানপশারি দেখা হল, মানুষজনের সঙ্গে পরিচয় হল। আর এরই ফলে সাহেববাড়ির চাকরি গেলেও সে অকূলপাথারে পড়ল না।

একটা চা-রুটির দোকানে চাকরি পেয়ে গেল দুখু। হুগলির লোক, দোকান দিয়েছেন এই এত দূরে এসে, আসানসোলে। মালিকের নাম এম. বখ্‌শ। খাওয়া মিলবে, মাইনে যৎসামান্য—মাসে এক টাকা। তবে থাকা চলবে না, যেহেতু জায়গা নেই। চমৎকার! নিজের কপালের ওপর হিংসেই হয়। কিন্তু রাত কাটাবার একটা যেমন-তেমন ডেরা যে চাই! বেশি ভাবতে হয় না, উপায় বেরিয়ে যায়। রুটির দোকানের ঠিক পাশেই এক তিন-তলা বাড়ি। তার সিঁড়ির নিচে এক কোণে শুয়ে থাকলেই-বা কে কী বলছে? রাতের ঘুমটুকুই তো! সঙ্গে তো তার জিনিসপত্তরের কোনো বালাই নেই, কোনো চালচুলো নেই। তা হলে ভাবনা কী!

অতঃপর রাতের আস্তানা হোক সিঁড়ির নিচে। তাই হল।

ত্রিতল এই ভবনে এক দম্পতি থাকতেন, ভাড়াটে। কাজী রফিজউল্লাহ্। পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর। তাঁর স্ত্রী শামসুন্নেসা খানম। স্বামী-স্ত্রীর ছোট্ট সংসার। ছেলেপুলের ঝক্কি নেই, আত্মীয়স্বজনের দৌরাত্ম্য নেই, নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। দেশ পুব-বাংলায় : ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানায় কাজীর-সিমলা গ্রামে। চাকরি উপলক্ষেই বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে থাকা, আর কি! ঘুমন্ত দুখুকে এক দিন সিঁড়ির নিচে আবিষ্কার করেন ভদ্রলোক। কী ব্যাপার! এ কে? চোর-ছ্যাঁচোড় নয় তো? নাহ্, দেখে তো তেমন লাগছে না। হাজার হোক পুলিশের চোখ! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘুমন্ত কিশোরকে জরিপ করতে থাকেন। বাঃ, দেখতে তো বেশ ছেলেটি! দুস্থ অবশ্যই, চেহারা-কাপড়জামা সবেতেই তার ছাপ। তবে বখাটে বেয়াড়া বলে তো মনে হয় না। কৌতূহলী হলেন। কৌতূহল নিবৃত্তও হল। ততক্ষণে দুখুর পারিবারিক কাহিনী শুনতে শুনতে সাব-ইন্সপেক্টরের মন গলে গেছে। ভালো বংশের ছেলে, অভাবে পড়েছে, তবু ছ' ক্লাস অবধি পড়াশুনা করেছে। এই একরত্তি বাচ্চার এত কষ্ট সয়! বাছা, তুমি বরং আমাদের সঙ্গেই থাকো। খাওয়াদাওয়া সব ফ্রি, আর মাস গেলে মাইনে পাঁচ টাকা। কাজ আর কী? ফাইফরমাশ খাটা। অর্থাৎ চাকরের কাজ। তাই সই, দুখু মিঞার চাকর হতেও আর আপত্তি নেই। জীবন যে কী কঠিন সে তো অনেক আগে থেকেই হাড়ে হাড়ে তা টের পাচ্ছে। বেঁচে থাকাই যেখানে সমস্যা সেখানে কি কোনো অহংকার সাজে? খাদেম-ইমাম দুখু মিঞা, লেটো দলের কবি দুখু মিঞা, বাবুর্চি-খানসামা দুখু এবার গৃহভৃত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নাহ্, ভাগ্য ভালো, পরিশ্রম এমন কিছু নয়—ঐ রুটির দোকানে হাড়ভাঙা খাটুনির চেয়ে হাজার গুণ ভালো। কাজের মধ্যে প্রধান কাজ কাজী সাহেবকে তামাক সেজে দেওয়া। নিঃসন্তান দম্পত্তির অপত্যস্নেহ দুখুকে ঘিরে রাখে।

কাজী সাহেবের বাসায় তিন মাসের বেশি তাকে চাকরি করতে হল না। নবনিযুক্ত গৃহভৃত্যের মেধা ও পড়াশুনোর প্রতি আগ্রহ নিশ্চয়ই তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, উপরন্তু তাঁরা ছিলেন যথার্থ সজ্জন। গান ও কবিতা রচনায় দুখুর দক্ষতাও হয়তো এরই মধ্যে তাঁরা জেনে থাকবেন। যাই হোক, তাঁদের বিবেচনায় দুখুকে স্কুলে ভর্তি করানোই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। কিন্তু কোথায়, কোন স্কুলে ভর্তি করাবেন? পুলিশের চাকরি তো বদলির। আজ এখানে, তো কাল ওখানে। বারবার জায়গাবদলে পড়াশুনো এগোবে না। তার চেয়ে বরং গ্রামের স্কুলেই ও ভর্তি হোক। সেটাই ঠিক হল। রফিজউল্লাহ্ সাহেবের বড়ো ভাই কাজী সাখাওয়াতউল্লাহ্ গ্রামে থাকেন। তাঁর কাছেই থাকবে, পড়াশুনো করবে। কাজীর-সিমলা গ্রাম, সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে দরিরামপুর হাই স্কুল। সেখানেই দুখু ভর্তি হল, সপ্তম শ্রেণীতে। থাকা–খাওয়া কাজী-বাড়িতে এবং সেখান থেকে স্কুলে যাওয়া–আসা। তা ছাড়া পড়ার জন্যে কোনো খরচ নেই, ফ্রি স্টুডেন্টশিপ মিলেছিল। ঘটনাটি ১৯১৪ সালের, নজরুল তখন পনেরো বছরের কিশোর।

পূর্ববঙ্গের এই পাড়াগাঁয়েও নজরুলের ছাত্রজীবন দীর্ঘ হয় নি। জন্মভূমি রাঢ় অঞ্চলের তীক্ষ্ণ কঠিন ঋজু সুষমা থেকে এই শ্যামল বৃষ্টিমলিন নদীমাতৃক দেশে পা ফেলে কী মনে হয়েছিল দুখুর? হতে পারে, তার মোটেও ভালো লাগে নি। কাজী-বাড়িতেও এই ছেলে দীর্ঘদিন থাকে না। সে কি ইশকুলে যাওয়া–আসার পথশ্রম, নাকি আশ্রিতের প্রতি অনাদর? কী কারণ? পরে স্কুলের কাছেপিঠে একটা জায়গা বেছে নেয় দুখু থাকবার জন্যে, অবশ্যই কারো বাড়ি। কিন্তু এও তো এক আশ্রয় থেকে আরেক আশ্রয়ে যাওয়া, অন্যের গলগ্রহ হওয়া! দুখুর মন কি সে–জন্যেই খারাপ থাকত? ক্লাসে সে কখনো দুষ্টুমি করে নি। স্কুলে দস্যিপনার কোনো রেকর্ড তার নেই। সে অন্যমনস্ক থাকত সব সময়। মাষ্টারমশায় প্রশ্ন করলেই সে ঘাবড়ে যেত, যেন এইমাত্র জেগে উঠল কোনো স্বপ্ন থেকে, ফিরে এল রূঢ় বাস্তবে। দ্বিতীয় বার প্রশ্নের উত্তর অবশ্য ঠিকঠাক। তার কোনো নতুন বন্ধুও হল না দরিরামপুরে। বড়োই একা সে। প্রায়ই দেখা যেত, স্কুলের কাছে ঠুনিভাঙা ঝিলের ধারে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। শুধু এক বার, মাত্রই এক বার সারা স্কুল সে চমকে দিল। মহিম বাবু—মহিমচন্দ্র খাসনবীশ, ক্লাসে ইংলিস ট্রানস্লেশন করান। তাঁরই পরিচালনায় বিচিত্রানুষ্ঠান হচ্ছে স্কুলে। স্কুল তো কোন ছার, সমস্ত তল্লাট সরগরম। শহর থেকে দূরে এসব স্থানে আনন্দের হুল্লোড় তো রোজ রোজ হয় না। কোনো প্রস্তুতি নেই, রিহার্সাল নেই, ক্লাস সেভেনের ছাত্র কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা আবৃত্তি করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি কবিতা : 'দুই বিঘা জমি' আর 'পুরাতন ভৃত্য'। রবীন্দ্রনাথকে দুখু প্রথম কবে, কোথায় আবিষ্কার করেছিল? দরিরামপুরে পড়তে এসেই কি? হয়তো তার পাঠ্য বইয়েই ছিল এই দুই কবিতা। কিন্তু এই যে আলাপ হল, এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ সে আর ছাড়ে নি।

স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হল। চমৎকার রেজাল্ট। প্রথম না দ্বিতীয় হয়ে ক্লাস এইটে প্রোমোশন। তাতেই-বা কী! দুখু কি আর ফলাফলের খবর শোনার জন্যে বসে আছে? পরীক্ষা খতম, তো দে ছুট। আবার পাথর–কাঁকর ভরা গেরুয়া মাটির দেশে, ধু–ধু প্রান্তরে, উদাসীন আকাশের নিচে। ফিরে আসা সেই জন্মের লোকালয়ে।

এ যেন ঘরের ছেলের ঘরে ফেরা, প্রবাসীর দেশে ফেরা। হৈ–হৈ করে উড়ে যাচ্ছে সময়। ময়মনসিংহ ফিরে যাবার লক্ষণ নেই। যে কাজী রফিজউল্লাহ্‌র জন্যে এত কিছু হল,

তার ধারেকাছে ঘেঁষে না এই ছেলে। ভদ্রলোক এখন কোথায়? আসানসোলেই, নাকি বদলি হয়ে অন্যত্র? যার জানার কথা সেই দুখুই যদি না জানে তো আমরা জানব কোত্থেকে! দুখুর সঙ্গে তাঁর আর কখনো কোনোদিন দেখা হয় নি। শুধু একবার—। দুখু তত দিনে বড়ো বেশি বিখ্যাত : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। রফিজউল্লাহ্ সাহেব তখন বোধহয় আসামে। সরকারি কাজে কলকাতা এসেছেন। যাই, ছেলেটাকে একবার দেখে আসি, ভাবলেন। এত নাম করেছে! ওর জীবনে আমারও তো ছোট্ট একটুখানি ভূমিকা ছিল। দেখা করতে গিয়ে তো মহাবিপদ! সর্বনাশ! সেই দুখু মিঞা আজ এত বিখ্যাত? তাও তো জজ ম্যাজিস্ট্রেট নয়। দেখা হবে না, স্লিপ দিতে হবে। এতই ব্যস্ত তোমাদের কাজী নজরুল ইসলাম! একবার ভাবলেন, ফিরে যাই। আবার মনে হল, নাঃ, এসেছিই যখন তখন দেখাটা করেই যাই। সেদিনকার সেই ছোট্ট ছেলে আজ এত বড়ো হয়েছে, একটু চোখে দেখব না—তাও কি হয়? এলুমই যখন, দেখা করি। স্লিপে নিজের নাম লিখলেন কাজী রফিজউল্লাহ্। বেয়ারাকে দিলেন,—যাও বাপু, ভিতরে দিয়ে এস। ভিতরে কবি ব্যস্ত কোনো কিছু রচনায়। বেয়ারা পা টিপে-টিপে ভিতরে যায়, চিরকুটটা আস্তে ভয়ে-ভয়ে টেবিলে রেখে বেরিয়ে আসে। কবি লিখে চলেন। কাগজ কলম মন, লেখে তিন জন। অন্য কোনো দিকে চোখ নেই, স্থিরবদ্ধ দৃষ্টি কাগজের উপরে, কলম তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। চিরকুট নজরেই পড়ে না। সময় বয়ে যায়...দশ মিনিট...বিশ মিনিট...আধ ঘণ্টা ...এক ঘণ্টা...। কাজের লোকের পক্ষে আর কতক্ষণই-বা বসা সম্ভব? রফিজউল্লাহ্ সাহেব চলে যান। দুঃখিত, ক্ষুব্ধ, অপমানিত। লেখা শেষ হলে কবি চোখ তুলে চারদিকে দেখেন। চিরকুট কে দিলে! কাজী রফিজউল্লাহ্। সে কি, কই তিনি? ছিঃ ছিঃ, কতক্ষণ ধরে বসে আছেন না জানি—আমি দেখিই নি। বেয়ারা, এক্ষুনি ডেকে আনো। দেখা হয় না। লজ্জায় গ্লানিতে, অপরাধবোধে, যন্ত্রণাবিদ্ধ কবি দিশেহারা হয়ে যান। ছিঃ ছিঃ, এ তিনি কী করলেন! তাঁর নিজের কাছেই ক্ষমা নেই এই অন্যায়ের। তক্ষুনি ছুটলেন টেলিগ্রাম করতে। ক্ষমা চাইলেন, বুঝিয়ে লিখলেন কী হয়েছিল। জানালেন, নিজেই সময় করে দেখা করতে যাবেন এক দিন, অনিচ্ছাকৃত অপরাধের যেন মার্জনা মেলে। কিন্তু সাক্ষাতের সুযোগ আর মেলে নি। রফিজউল্লাহ্ সাহেব দু' বছর পর মারা গেলেন যক্ষ্মায়।

দুখু তুমি কি চিরকালই সেই একই রকম উদাসীন, খামখেয়ালিই রয়ে গেলে! দরিরামপুরের অন্যমনস্কতা আর ঘুচল না?

৬

ময়মনসিংহ থেকে না হয় পালানো গেল, কিন্তু পড়াশোনা থেকে? নিজের ঘরে ফিরে এলুম বলেই কি আর পড়াশুনো হবে না? লেখাপড়া করতে চাইলেই বুঝি দূরদেশে যেতে হয়! দুখুর মনে শান্তি নেই। অথচ স্কুলে যাওয়া কী সহজ ব্যাপার! কেবল পয়সা থাকলেই হয়। দুখু, তোমার তো পয়সা নেই।

রাণীগঞ্জ আসানসোলের কাছেই, চুরুলিয়া থেকেও তেমন দূরে নয়। এক বন্ধু সেখানকার শিয়াড়শোল রাজ হাই স্কুলে পড়ে। দেখা করতে গেল এক দিন। এমন কি হয় না, সেও পড়তে পায় ওখানে? না। শিয়াড়শোল স্কুলেও পয়সা লাগে। কী করা! মনের দুঃখে দীর্ঘ চিঠি লেখে বন্ধুকে। বন্ধুটি তখন স্কুলে। ঘরে ফিরে এসে সেই চিঠি পায়। দুঃখভরা চিঠি এতই করুণ যে হেডমাষ্টারকে না দেখিয়ে বন্ধুটি তৃপ্তি পায় না। হেডমাষ্টার তো হতবাক! ক্লাস সেভেনে পড়তে চায়, সেই ছেলের এই লেখা? বলে কী! ভাষার কী বাঁধুনি, কী সুন্দর হাতের লেখা! ব্রিলিয়াণ্ট! এক্ষুনি নিয়ে এস।

ব্যস, ঝামেলা চুকল। ফের ক্লাস সেভেনেই ভর্তি হল নজরুল। সে তো আর জানত না যে দরিরামপুর স্কুলে সে প্রথম স্থান অধিকার করে ক্লাস এইটে উঠেছে। এখন থেকে আর সে দুখু মিঞা নয়; এবার থেকে নজরুল, সকলের কাছে। শুধু কারো কারো কাছে কেবল নুরু। ছোট্ট মিষ্টি নাম। ভালোবাসার ডাক। বার্ষিক পরীক্ষায় ফল এতই ভালো হল যে এইটকে ডিঙিয়ে এক লাফে ক্লাস নাইন, একেবারে ডবল প্রোমোশন। নুরুর এই সব গল্পও লিখেছে তার বন্ধু শৈল। স্কুলের গল্প :

> ব্যবস্থা হলো, শিয়াড়শোল রাজার ইস্কুলে মাইনে লাগবে না, সেইখানেই পড়বে। থাকবে রায়-সাহেবের ফুল-বাগানের পাশে মাটির একটি ছোট্ট ঘরে। খড় দিয়ে ছাওয়া এই ছোট্ট ঘরখানির নাম— 'মহমডেন্-বোর্ডিং'।...
>
> একদিকের একটি জানলার পাশে ছোট একটি খাটিয়া। খাটিয়ার ওপর পরিষ্কার একটি বিছানা পাতা। বিছানার ওপর ছোট ছোট দুটি বালিশ আর বই-খাতার ছড়াছড়ি। দেখলেই চেনা যায়—অগোছালো কোন্ এক ছন্নছাড়া ছেলের আস্তানা।
>
> ... ...
>
> নজরুলের টাকা-পয়সা থাকত তার বিছানার তলায়। টাকা-পয়সা বলতে শিয়াড়শোল রাজবাড়ি থেকে পাওয়া মাসিক সাতটি টাকা। ইস্কুলে বেতন দিতে হতো না, বোর্ডিং-এর খরচ দিতে হতো না, সাতটি টাকা পেতো সে নিজের খরচের জন্যে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! বিছানার তলাতেই থাকতো, সেইখান থেকেই খরচ হতে হতে একদিন শেষ হয়ে যেতো। সাত টাকার বেশির ভাগ নিতো...বিস্কুটওলা। তারপর চলতো ধার। সে ধার শোধ করতাম হয় আমি, নয় আমাদের আর-এক সহপাঠী বন্ধু শৈলেন ঘোষ। সে ছিল ক্রিশ্চান। সে দিত। একবার একটা ভারি মজা হয়েছিল। মাসের প্রথমেই রাজবাড়ি থেকে সাতটি টাকা নজরুল নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে। বোর্ডিং-এ এসে দেখে, তার ছোট ভাই আলি হোসেন এসেছে গ্রাম থেকে। সচ্ছল সংসার নয়। দারিদ্র্যের জ্বালা লেগেই আছে। দুঃখ কষ্টের কথা পাছে বেশি শুনতে হয় তাই তাড়াতাড়ি সাতটি টাকাই আলি হোসেনের হাতে দিয়ে নজরুল তাকে বিদেয় করে দিয়েছে।

হরিহর আত্মা বন্ধু তিন জন : নুরু, শৈল আর শৈলেন। কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আর শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ। এক জন মুসলমান, এক জন হিন্দু, এক জন খ্রিষ্টান। দুর্ভাগ্য যে, বর্ধমান অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকজন নেই। থাকলে নির্ঘাত বৌদ্ধ বন্ধুও জুটে যেত। এই হচ্ছে নজরুল। ধর্মের বাছবিচার নেই, সমাজের তোয়াক্কা নেই। তোমার হৃদয় থাকলে এসো, আমার হৃদয়ের পাশে বসো। স্বার্থ থাকলে আমি নেই, প্যাঁচবুদ্ধি থাকলে আমি নেই! সারা জীবন এইভাবে কেটেছে। বয়স বাড়লে কমবেশি সব লোকই পাল্টায়। পাল্টায় না কেবল নজরুলদের দল। লেটোর দলেও যা, শিয়াড়শোল

স্কুলেও তাই; আবার অখ্যাত থাকলেও যা, বিখ্যাত হলেও তাই। সমস্ত জীবন একই তালে লয়ে ছন্দে বাঁধা।

শিয়াড়শোল রাজ হাই স্কুল এমন কিছু নামকরা স্কুল নয়। তবু নজরুলের জীবনে এত দূরপ্রসারী ভূমিকা আর কেউ নেয় নি। যে-নজরুল পল্টনে নাম লেখাবে, যে-নজরুল কবি হবে, যে-নজরুল গান গাইবে, যে-নজরুল রাজনীতি করবে, যে-নজরুল আড্ডা দেবে এবং আর সবাইকে টেনে নিয়ে আসবে আড্ডায়, সেই নজরুলের জন্ম এই বিদ্যাপীঠে, এই রাণীগঞ্জে। কেন? কেমন করে? সেই কাহিনীই বলি।

এখানে সে ছিল মোটে তিন বছর : ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সাল। সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত, মধ্যিখানে বাদ ক্লাস এইট। প্রখর মেধাবী, তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি, তাই হাসিখেলার ভিতর দিয়েই পড়াশোনার কাজ সারা হয়। ক্লাসে প্রথম বা দ্বিতীয় হতে হলে সারা দিন বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হয় নাকি! যাদের হয় হোক, নজরুলের হয় না। স্কুলের বাইরে তা হলে সব সময়টাই ছুটি। কাটে কেমন করে? সময় কাটাবার আবার ভাবনা! বরং সময়ের নাগালই পায় না তিন বন্ধু। শৈলেনদের বাড়িতে একটা হার্মোনিয়াম আছে। ভাঙা হার্মোনিয়াম, তবু তাই নিয়েই কসরত চলে। পানি দেখলে ভয় পায়, সাঁতার জানে না নুরু, তাই পুকুরে নামে না। লজ্জায় কাউকে বলতে পারে না। বোর্ডিংয়ের পাতকুয়ো থেকে পানি তুলে গোসল করে। মুখে বোল্‌চালের কমতি নেই, বলে—খান্দানি লোকেরা সকলের সামনে বেআব্রু গা উদোম করে পুকুরে লাফায় না, ভদ্র সন্তানের স্নান গৃহেই উত্তম। বলে— কুয়োর পানি কী ঠাণ্ডা, দেহ-মন জুড়িয়ে যায়! চালাকিটা শৈলই ধরে ফেলে। চ', তোকে সাঁতার শিখিয়ে দিই। কী লজ্জা! তোর বাড়ির পাশে পীরপুকুর, তোর গাঁয়ের ধারে অজয় নদ, আর তুই কিনা সাঁতার জানবি না! গালগপ্পো রাখো, দয়া করে কাউকে বলতে যেও না, লোকে হাসবে। তারপর আর কি! সাঁতারের চৈষ্টা, এবং দু' বন্ধুরই সলিলসমাধি হওয়ার জোগাড়। পাশের ঘাটে স্নান করছিল মকবুল, সেই বাঁচিয়ে দিল। শৈলর নানা জাঁদরেল রায়বাহাদুর। তাঁরই কোচোয়ান মকবুল। লাভের মধ্যে লাভ— শৈলবাবুর পুকুরে যাওয়া বন্ধ, নানার হুকুমে। ওদিকে নুরুকে কিন্তু দু' দিনেই সাঁতার শিখিয়ে দিল মকবুল। অতঃপর পানিতে দাপাদাপি করেও কি কম সময় কাটে! বন্ধু পঞ্চু খাস কলকাতা থেকে একটা এয়ারগান আনিয়েছে সাহেবের দোকানে চিঠি লিখে। রীতিমতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তবু কি প্রাণ ধরে এয়ারগান হাতছাড়া করা যায়? পঞ্চু শিকারে বেরোয় ভারিক্কি চালে, পিছন পিছন যায় নুরু আর শৈল। শেষে এক মহা কেলেঙ্কারি। পাখি তো এক দিনের তরেও পড়ল না, এদিকে বেতালে গুলি লেগে পঞ্চুর বৃদ্ধা জেঠাইমা'র কনুইয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড। যদি বুকে লাগত, কি মাথায় লাগত! কাজ নেই অমন সব্বোনেশে জিনিস দিয়ে। নুরুর বিছানার ওপরে বন্দুকটা রেখে দিয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। পরের ঘটনা নিরতিশয় সহজ—এ পক্ষের স্নান-আহার প্রায় বন্ধ।

শিকারের নেশা কি এতই তীব্র নজরুলের? পাখি মেরে করবেই-বা কী? ওর নিজের তো কোনো চালচুলো নেই, ঘরবাড়ি নেই; থাকে বোর্ডিয়ে—পাখি মারলেও রোজ রোজ রান্নাবান্না করে আদর করে মাদুর পেতে তাকে খেতে দিচ্ছে কে? না, তা নয়। পাখির দিকে নুরুর নজর যায় নি। ওরা মুক্ত স্বাধীন বিহঙ্গ, উড়ে বেড়াক যেমন খুশি যেথা ইচ্ছা। তা ছাড়া, পাখি মারবে নজরুল! ওর যা নরম মন! দালানে বাসা বেঁধেছিল চড়ুই। তার একটা কচি বাচ্চা হঠাৎ করে পড়ে গেল নিচে, মাটিতে। তখনো বেচারা উড়তে শেখে নি।

ওপর থেকে চড়ুই-মা'র সে কী চেঁচামেচি, কান্না! শেষ পর্যন্ত কোত্থেকে খুঁজেপেতে একটা মই ঘাড়ে করে নিয়ে আসে নুরু, মই বেয়ে ওপরে উঠে চড়ুইয়ের বাসায় চড়ুইছানাকে রেখে তবে শান্তি। ঐটুকুতেই শেষ নয়—। এতই আলোড়িত হয়েছিল সে যে শেষ পর্যন্ত ছাব্বিশ লাইনের এক দীর্ঘ কবিতাই লিখে ফেলল :

মস্ত বড় দালান বাড়ীর উই লাগা ঐ কড়ির ফাঁকে
ছোট একটি চড়াইছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মা'কে।
'চুঁ চা' রবের আকুল কাঁদন যাচ্ছিল নে' বসন-বায়ে
মায়ের পরাণ—ভাবলে বুঝি দুষ্টু ছেলে নিচ্ছে ছায়ে।
অমনি কাছের মাঠটি হতে ছুটলো মাতা ফড়িং মুখে
স্নেহের আকুল আশীষ-জোয়ার উথলে উঠে মার সে বুকে!
আধ-ফুরফুরে ছা'টি নীড়ে দেখছে মা তার আসছে উড়ে,
ভাবলে আমিই যাই না ছুটে, বসিগে মার বক্ষ জুড়ে।
হৃদয়-আবেগ রুখতে নেরে উড়তে গেল আবোধ পাখী
ঝুপ করে সে গেল পড়ে—ঝরল মায়ের করুণ আঁখি!
হায়রে মায়ের স্নেহের হিয়া বিষম ব্যথায় উঠলো কেঁপে
রাখলে নাকো প্রাণের মায়া, বসলো ডানায় ছা'টি ঝেঁপে।
ধরতে ছুটে ছানাটিরে ক্লাসের যত দুষ্টু ছেলে;
ছুটছে পাখী প্রাণের ভয়ে ছোট দুটি ডানা তুলে।
বুঝতে নারি কি সে ভাষায় জানায় মা তার হিয়ার বেদন
বুঝে না কেউ স্কুলের ছেলে—মায়ের সে যে বুকভরা ধন।
পুরছে কেহ ছাতার ভিতর, পকেটে কেউ পুরছে হেসে,
একটি ছেলে কাঁদছে আঁসু চোখ দুটি তার যাচ্ছে ভেসে।
মা মরেছে বহুদিন তার ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ
তবু গো তার মরম ছিঁড়ে উঠল বেজে করুণ বেহাগ।
মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে
ছানার দুটি সজল আঁখি করলে আশীষ পরাণ খুলে।
অবাক-নয়ান মা'টি তাহার রইলো চেয়ে পাঁচুর পানে
হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা আঁখির কোণে।
পাখীর মায়ের নীরব আশীষ যে ধারাটি দিল ঢেলে
দিতে কি তার পারে কণা বিশ্বমাতার বিশ্ব মিলে!

কবিতা লিখতে গিয়ে স্কুল কামাই গেল। বিকেলবেলা শৈল এলে তার হাতে তুলে দেয় নুরু। বলে, পড়ে দ্যাখ, তোমার ভাত মেরে দিয়েছি! তুই তো কবিতা লিখিস, এই দ্যাখ্ আমিও লিখে ফেলেছি। শৈল অবাক! দ্যাখো কাণ্ড, তুই আবার আমাদের পঞ্চু, মানে পাঁচুর কথা পর্যন্ত লিখেছিস! শৈল তো অবাক হবেই, কারণ সে তখন খাতা ভরিয়ে ফেলেছে কবিতা লিখে লিখে আর নুরু লিখছে ছোটো ছোটো গল্প। অথচ তারা আরো বড়ো হলে ঘটল ঠিক উল্টোটাই; শৈলজানন্দ হলেন গল্পকার, আর নজরুল কবি। এখানে থাকতে অবশ্য শুধু ঐ পক্ষীশাবককে নিয়েই কবিতা নয়, লেখা হয়েছিল আরো কবিতা। যেমন 'রাজার গড়' কিংবা 'রাণীর গড়'। 'রাজার গড়' বেশ বড়ো কবিতা, পাখির কবিতার

মতোই।. রাজার গড় কোথায়? কেন, চুরুলিয়ায়। রাজা নরোত্তমের গড়। তাই নিয়েই তো ঐ কবিতা। 'রাণীর গড়' তো স্পষ্টই রাণীগঞ্জকে নিয়ে লেখা, পড়লেই বুঝতে পারা যায়। কবিতাটি অবশ্য বড়ো নয় :

ওই—ঝাউএর পাহাড়ে নীরব চিতাটি রাণীমা'র!
ও যে—দপ্ দপ্ জ্বলে, লোকে বলে আলো আলেয়ার।
এই নিবে যায় এই জ্বলে ওঠে
থমকি চমকি পিছু দিকে ছোটে,
মিশে যায় শেষে রাজ-গড়ে উঠে
আবার তেমনি আঁধিয়ার!
ওই শোনা যায় দু'পহর রাতে
ঝটিকার মুখে হাহাকার।
ওগো রাণীমা'র—আহা রাণীমা'র!
ওই—ঝাউএর পাহাড়ে নীরব চিতাটি রাণীমা'র!

তাই বলছিলুম, সময় কাটাবার আবার ভাবনা! কবিতার লাইন মগজে এসে গেলে তো আর কথাই নেই—সময় কোথা দিয়ে চলে যায়! তখন দিনের বেলাতেও আর কুলোয় না, রাত জাগতে হয়—হয়তো সারা রাতই জেগে থাকতে হয়। যতক্ষণ মগজের চিন্তাগুলো ছন্দের আকারে খাতার পাতায় না ফুটে উঠছে ততক্ষণ শান্তি নেই। এ ছাড়াও আছে ইংরেজি শেখার পরিশ্রম। না, বই পড়ে, গ্রামার মুখস্থ করে ট্রানস্লেশন করে নয়। ও সব হচ্ছে মাথামোটা পড়ুয়া গুড বয়দের কাণ্ড, নুরু ও-সবের মধ্যে নেই। ওর হচ্ছে ডাইরেক্ট এ্যাকশন—গ্রামার আর ট্রানস্লেশন বইয়ের মধ্যস্থতার কী প্রয়োজন? শিখব তো সোজা সরাসরি শিখব। অতএব, ধরা দিতে হয় এক সাহেবের কাছে। সাহেব হলে কি! এ-সাহেবও ওরই মতো গরিব, কোনো ডাঁট নেই, চালচুলো নেই। থাকার মধ্যে আছে এক বিরাট এ্যালসেশিয়ান কুকুর, যেন বাঘ—দেখলে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। ঐ কুকুরকে জয় করে তবে সাহেবের কাছে যাওয়া। সেই অসাধ্যসাধনও হল। অথচ লাভ হল না কিছুই—সাহেব হতভাগা ইংরেজি বলতেই চায় না, বাংলা বলা প্র্যাকটিস করে। ইংরেজি শেখা লাটে উঠল, মাঝখান থেকে সময় কি কম নষ্ট হল!

কিন্তু আসল গল্পটাই তো বলা হচ্ছে না। ঐ এয়ারগানের গল্প। বন্দুক এখন নজরুলের দখলে। কী করা হচ্ছে সেটা দিয়ে? পাখির ধারেকাছে সে নেই, আমরা জানি। তবে? সে-গল্পও শুনিয়েছেন শৈলজানন্দ।

বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গেলাম নির্জন কবরখানায়।

শহরের একটেরে ক্রিশ্চানদের কবরখানা। ওর ত্রিসীমানায় লোকজন কেউ হাঁটে না। গাছও যত, পাখিও তত।

বন্দুকটা নজরুলের হাতে দিয়ে বললাম, মারো এই বার যত পারো।

কেমন করে চালাতে হয় শিখিয়ে দেবার প্রয়োজন হলো না। কিন্তু পাখি সে কিছুতেই মারবে না। মরুক না মরুক গায়ে তো লাগতো!

অথচ নজরুল সে রাস্তা মাড়ালে না। গোরস্থানের একদিকে সারি সারি কয়েকটি ইট-বাঁধানো বেদীই হল তার লক্ষ্য। তার ভেতর একটি বেদী হলো বড়লাট, একটি হলো ছোটলাট, একটি হলো ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, আর একটি হলো এস্-ডি-ও। তারপর একের পর এক চলতে লাগল তাদের ওপর আক্রমণ।

ইট দিয়ে বাঁধানো চুন-কাম করা বড় বড় বেদী। বেশী দূরেও নয়, মারতে গেলে পাখির মত উড়েও পালায় না। কাজেই হাতের তিকের বিশেষ প্রয়োজন হলো না। গোল গোল সীসের গুলি এয়ারগানের নলের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে ফটাস্ ফটাস্ করে লাগল গিয়ে দেশের শত্রু ইংরেজদের গায়ে।

একটা গুলি লাগে, আর নজরুলের সে কী উল্লাস!

নজরুলকে তখন বলেছিলাম, আমার আজও মনে আছে—'ওরা কি দোষ করলে বল তো? বড়লাট, ছোটলাট—ওরা তো চাকরি করে, ওরা কর্মচারী।'

নজরুল বলেছিল, না। ওরা ইংরেজের প্রতিনিধি। ইংরেজ মাত্রেই আমাদের শত্রু। ওরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাক।

—নইলে তুমি ওদের মেরে তাড়াবে?

—চেষ্টা করব। প্রাণের ভয়ে এদেশে কেউ আসতে চাইবে না।

... ...

ক্রিশ্চানদের গোরস্থান ছেড়ে দিয়ে আমরা তখন এসেছি আমাদের বাগানে। বাগানের পশ্চিমদিকের প্রাচীরের কোলে কোলে সারি সারি পেঁপে গাছে তখন বড় বড় পেঁপে ধরেছে।

বন্দুকের হাত-বশ করতে হলে বড় বড় পেঁপে হচ্ছে সবচেয়ে ভাল। সীসের ছড়রা পেঁপের গায়ে প্যাঁক্ করে বসে যায়। গুলি ঠিক লাগল কিনা বোঝবার ভারি সুবিধে।

প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা গেছে নজরুলের।

গোরস্থানের বেদীটা ছিল বড়, বন্দুকটা কোনোরকমে চালিয়ে দিলেই যেখানে হোক লেগে যেতো, কিন্তু পেঁপে তার চেয়ে ছোটো জিনিস, হাতের নিশান পাকা না হলে পেঁপের গায়ে গুলি লাগানো শক্ত।

তিনদিন লাগল নজরুলের হাত ঠিক করতে।

প্রথম যেদিন গুলি লাগল পেঁপের গায়ে, নজরুলের সেদিন সে কী আনন্দ!

সেই পেঁপে গাছটাই হল বড়লাট।

তার পরের গাছটা ছোটলাট, তার পরেরটা ম্যাজিস্ট্রেট, তারপর এস-ডি-ও, তারপর থানার বড় দারোগা, ছোট দারোগা ইত্যাদি ইত্যাদি—

বলেছিলাম, না না থানার দারোগাদের মেরো না; ওরা তো ইংরেজ নয়, ওরা বাঙালী।

নজরুল বলেছিল, হোক বাঙালী! ওরা বিশ্বাসঘাতক। একদিনে সব চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইংরেজের রাজত্বটা অচল করে দিয়ে চলে যাক না!

এমনি-সব কথা, আর বন্দুক দিয়ে ইংরেজকে মেরে তাড়াবার খেলা আমাদের জোর চলতে লাগল কয়েকদিন ধরে।

... ...

নজরুলকে সেদিন বললাম, চল যাই পঞ্চুর কাছে। আরও কিছু ছড়রা নিয়ে আসি।

নজরুল বললে, দাঁড়াও, ওর পঞ্চম জর্জকে মারি আগে।

বললাম, না না ও-বেচারা অনেক দূরে থাকে, ওর সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ?

নজরুল বললে, ওই তো পালের ধাড়ি। ও তো ফট করে এক দিন সবাইকে ডেকে বলে দিতে পারে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে দিলাম। ব্যাস্, একদিনেই আমরা স্বাধীন।

—ঠিক বলেছ। তাহলে লাগাও—ওকে আজই শেষ করে দাও।

কিন্তু না, অত সহজে ওকে মারা চলবে না।

কিছুক্ষণ আগেই আমি মেরেছি পুলিশ-সাহেবকে। মেরেছি অনেক দূর থেকে, প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে, খুব সাবধানে। দূরের একটা গাছের সবচেয়ে ছোট একটি পেঁপে হয়েছিল পুলিশ-সাহেব।

নজরুলকেও তেমনি করে মারতে হবে। সবচেয়ে দূরে যে পেঁপে গাছটা রয়েছে, সেই গাছের বড় একটি পেঁপের গায়ে লাগাতে হবে পর পর দুটো গুলি।

পেঁপেটি দেখিয়ে দিলাম। হাঁটু গেড়ে বসলো নজরুল। কায়দা করে ধরলে বন্দুকটা। এক চোখ বন্ধ করে নিশান করলে। তারপর—

ব্যাস! দিলে লাগিয়ে প্রথম গুলিটাই!

চললো আমাদের ধেই ধেই করে নৃত্য!

নজরুল চুপ করে থাকবার ছেলে নয়। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল— খতম! পঞ্চুর পঞ্চম জর্জ খতম!

এত রাগ কিসের নজরুলের? কেন এত রাগ? এ আবার অন্য এক কাহিনী। এক দিকে যেমন শিয়াড়শোল স্কুলের, অন্য দিকে তেমনি সমগ্র দেশের, পরাধীন ভারতবর্ষের।

৭

সময়টা তখন আকাশ-বাতাস তোলপাড় করা। সময় মানে — এই শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছর। তারই মধ্যে আবার সবচেয়ে বিক্ষুব্ধ রাগী লাল গনগনে চেহারা প্রথম বিশ বছরের। বাংলা দেশে তখন সন্ত্রাসবাদের যুগ, স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। স্বদেশী, সন্ত্রাসবাদ—এসব কথার অর্থ কী? এদেশের মাটিতে জন্মেছি, এই তো আমার স্বদেশ, নিজের দেশ। ঠিক তাই। সে-জন্যেই তুমি স্বদেশী—মানে, তোমার নিজের দেশকে যারা 'নিজের' বলতে দিতে চায় না তাদের বিরুদ্ধে তোমার লড়াই। স্বদেশের জন্যে তোমার সংগ্রাম বলেই তুমি 'স্বদেশী'। মূল কথা, ইংরেজদের তাড়াতে হবে। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসে ওরা এ সোনার দেশটাকে ছারখার করে দিল। অত্যাচার, জুলুম, অপমান, নির্যাতন—এর কোনো শেষ নেই! অথচ দেশটা কি ওদের? উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। সমানে টাকা লুটছে আর সেই টাকা দিয়ে তাদের নিজের দেশকে সাজাচ্ছে। আমার মা-কে খুন করে গা থেকে গয়না খুলে নিয়ে তার নিজের মা-কে সাজাচ্ছে। এত ঔদ্ধত্য এত সাহস হয় কী করে? হয় গায়ের জোরে, অস্ত্রের দম্ভে। ঐ বিষদাঁত ভেঙে দিতে হবে। অস্ত্র দিয়েই ভাঙতে হবে; বন্দুক পিস্তল বোমা দিয়ে। স্বদেশী আন্দোলনের এটাই মূল কথা : ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে স্বেচ্ছায় যেতে না চাইলে মেরে তাড়াতে হবে। আর সন্ত্রাসবাদ? ও তো ইংরেজদেরই বুলি—টেররিস্ট, টেররিজম! ওরা সন্ত্রস্ত হচ্ছে, এদেশের ছেলেরা ওদের মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে, তাই সন্ত্রাসবাদ। তা, কী দরকার বাপু কালো আদমিদের ভয়ে জুজু হয়ে থাকবার? দেশ ছেড়ে চলে গেলেই তো পার—আমরাও বাঁচি, তোমরাও বাঁচ। ইংরেজ না তাড়ানো পর্যন্ত ক্ষান্তি নেই। খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই, কেঁদে সুখ নেই, হেসে সুখ নেই।

এ হচ্ছে সেই যুগ—অগ্নিগর্ভ, সাহসী, বেপরোয়া।

অথচ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই কী করে সম্ভব? ওদের আছে বিশাল সৈন্যদল, থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারি, গুলি-গোলা, কামান-বন্দুক। ও-রকম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে জিততে হলে সমান শক্তি থাকা চাই। চাই সেনাবাহিনী, গুলি, কামান, বন্দুক।

পরাধীন দেশের ছেলেদের হাতে সে-সব কই? সামনাসামনি যুদ্ধে ওদের সঙ্গে পারা যাবে না, জানা কথা। অতএব দরকার—অতর্কিতে আঘাত হানা, ওদের প্রচণ্ডরকম ভয় পাইয়ে দেওয়া। সবই করতে হবে গোপনে, কেননা একবার যদি ওরা টের পায় তা হলে সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। গড়ে উঠল গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান : অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল।

অনুশীলন সমিতিই আদি সংঘ; এর গোড়াপত্তন ১৯০২ সালে। তবে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সক্রিয় ভূমিকা নেয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে। লর্ড কার্জন তখন বড়লাট। নিজের খেয়ালখুশি মতো বঙ্গদেশ ভাগ করলেন ১৯০৫ সালে। ছিল একটা দেশ, করে দিল দু' টুকরো। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন তারই নাম 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন'। বঙ্গভঙ্গ নিয়ে, স্বদেশী যুগ নিয়ে প্রচুর বইপত্র লেখা হয়েছে, ভবিষ্যতে আরো হবে। তোমরা সেগুলো পড়তে ভুলো না। বাঙালি জাতির জীবনে এত বড়ো বীরত্বের ও গর্বের দিন এর আগে কখনো আসে নি। বাঙালি যে বীর জাতি তা সে প্রথম অনুভব করে ঐ সময়ে। ঠিক ঐ একই রকম শৌর্য-বীর্য ও আশা-উদ্দীপনায় বাঙালি আর এক বার মেতেছিল—সে অনেক পরে, ১৯৭১ সালে।

কী হত অনুশীলন সমিতিতে বা ঐ ধরনের আরো বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে? কাজ সংক্ষেপে একটিই : বাংলার কিশোর ও যুব সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত করা। কিন্তু কোন উপায়ে, কেমন করে? পড়, প্রচুর বই পড়—দেশের অবস্থা জানো, বিদেশের ইতিহাস জানো, পড় ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি সম্পর্কে, অনুপ্রাণিত হও পৃথিবীর তাবৎ মহৎ ব্যক্তিদের কর্মে, ভাবনা ও চিন্তায়। কিন্তু, কেবলমাত্র মেধাচর্চা ও ভাবনাচিন্তাই নয়, নিজের শরীরের দিকেও তাকাও। অর্ধভুক্ত, অনাহারী, ভীরু, কাপুরুষ বঙ্গসন্তান চাই না; হতে হবে পুরুষসিংহ; শক্তসমর্থ সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, পরাক্রান্ত সাহসী। অতএব শরীরের উন্নতি চাই। ব্যায়াম কর : কুস্তি, লাঠিখেলা, তলোয়ার চালানো, ছুরি চালানো। এরই সঙ্গে আছে গোপনে গোলাবারুদ তৈরির পদ্ধতি শেখা। এক কথায়, নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করা। অনুশীলন সমিতির শাখা প্রশাখা সারা দেশে ছেয়ে গিয়েছিল, এক পূর্ববঙ্গেই শাখা ছিল পাঁচ শ'। পশ্চিম বাংলাতেও এই জোয়ার একই রকম প্রবল ছিল। ব্রিটিশ সরকার বিপদ উপলব্ধি করে এ-জাতীয় যাবতীয় প্রতিষ্ঠান বেআইনি বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

তবু দেশব্যাপী এ-হেন জাগরণ রুখবে কে? ফল অচিরেই ফলতে শুরু করেছিল। যেখানে-সেখানে যত্রতত্র হামলা চলছে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর ওপরে, পিস্তলের গুলিতে, বোমার আঘাতে। পুলিশের লোক, ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা হাকিম, জজ, গভর্নর সকলেই লক্ষ্যস্থল। গুলি-বোমা কখনো লক্ষ্যভেদ করেছে, কখনো-বা ফসকে গেছে। ধরা পড়েছে বিপ্লবীদের কেউ কেউ। অকথ্য নির্যাতন চলেছে, ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে গেছে আন্দামান। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে কখনো মনে করেছে আত্মহত্যাই শ্রেয়, তখন নিজের বুকে নিজেই গুলি চালিয়েছে। এদের বেশির ভাগই কিশোর এবং তরুণ। ক্ষুদিরামের যখন ফাঁসি হল তখন সে মাত্র উনিশ বছরের তরুণ। আর তার সঙ্গী প্রফুল্ল চাকী নিজের বুক তাক করে পিস্তলের ট্রিগার টিপল। এমন অসংখ্য ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী বাংলা মায়ের কোল আলো করে আছে সেদিন। এই যুগের শ্রেষ্ঠ গৌরবগাথা রচিত হয়েছিল চাটগাঁর জালালাবাদ পাহাড়ে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে। সে-যুগের কথা

পড়তে পড়তে আজও আমাদের প্রতি রোমকূপ শিউরে ওঠে, আবেগে, উত্তেজনায়, গর্বে। হায়, আমরাও তো সেই একই বাঙালি। অথচ কী অক্ষম, ভীরু, স্বার্থপর, দেশপ্রেমহীন। আজ এতটুকুও কি বোঝার উপায় আছে, আজকের এই সব শৃগালের পূর্বপুরুষ ছিলেন ঐ সিংহের দল?

নজরুল যখন শিয়াড়শোল স্কুলে তখন যুগের ঐ হাওয়া দেশটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গুপ্ত সমিতির সদস্য কোথায় নেই? সবখানে আছে, তবু বাইরে থেকে দেখে চেনার এতটুকু উপায় নেই। মাষ্টার-দা সূর্য সেন : টেকো মাথা, গোবেচারা ভালোমানুষ, স্কুলমাষ্টারি করেন, সাত চড়ে রা নেই। এ কি ভাবা যায়, তিনিই প্রধান নায়ক চট্টগ্রামে ঐ সশস্ত্র বিপ্লবের? দু' দিন ধরে চাটগাঁ শহরকে তাঁরা স্বাধীন রেখেছিলেন। নিবারণচন্দ্র ঘটককেও কেউ চেনে নি শিয়াড়শোল স্কুলে। চিনেছিল তখন যখন হঠাৎ পুলিশ ধরে নিয়ে গেল বিপ্লবী বলে এবং জেলও হয়ে গেল পাঁচ বছরের জন্য। মাষ্টারমশাই নিবারণ ঘটকের চোখে পড়েছিল এই বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ দরিদ্র ছাত্রটি, যার নাম কাজী নজরুল ইসলাম। রাজনীতি, বিপ্লব, পরাধীনতা, দেশের জন্যে যুদ্ধ—এই সমস্ত চিন্তা ও বোধ ধীরে ধীরে ছাত্রটির মনে এই মাষ্টারমশাই ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বন্ধু শৈল বা শৈলেন কাউকেই নুরু এ নিয়ে কোনো কথা বলে নি। সে যখন যুদ্ধে যাচ্ছে তখন খালি বলেছিল, তার উদ্দেশ্য যুদ্ধবিদ্যা শেখা, সে-উদ্দেশ্যেই সে যুদ্ধে যাচ্ছে, ফিরে এসে সেনাবাহিনী গঠন করে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের দেশছাড়া করবে। প্রথম মহাযুদ্ধ ততদিনে শুরু হয়ে গেছে ১৯১৪ সালে, তখনো কেউ জানে না কবে শেষ হবে।

পেঁপে তাক করে গুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে হাতের তিক বাগানো, সে কি অমনি অমনি!

এই স্কুলেই আরো দুটো ব্যাপার ঘটল। মাষ্টারমশাই সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল। গানপাগল মানুষ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা করেন। আর গান তো নজরুলের রক্তে। গুরু ও শিষ্য একে অন্যকে চিনে ফেলেন। মাষ্টারমশাইয়ের কাছে গানের তালিম নেয় নুরু, তাঁর বাড়ি গিয়ে গলা সাধে।

ওদিকে ফার্সির টিচার হাফিজ নুরুন্নবী সাহেবকে নিয়ে হয়েছে মহাজ্বালা। ইংরেজি বাংলা ছাড়া আরো একটি ভাষা তখন ছাত্রদের শিখতে হত— হয় সংস্কৃত, নয় আরবি-ফার্সি। নজরুলের ছিল সংস্কৃত। সে কি রে, তুই মুসলমানের ছেলে, তায় আবার কাজী বংশ, খান্দানি ঘর থেকে এসেছিস, তুই পড়বি সংস্কৃত? আচ্ছা বোকা তো! ওসব করো না, এবার থেকে আমার ক্লাশে এসে বসা চাই।মৌলভি সাহেব কি সত্যিই বকাবকি করেছিলেন নজরুলকে? আমরা জানি না। তবে একথা ঠিক যে, সংস্কৃত ছেড়ে ফার্সি নেওয়ার পিছনে এই শিক্ষকই ছিলেন। আসল কারণ অন্য। হিন্দু-মুসলমান, সংস্কৃত-ফার্সি—কোনো ব্যাপার নয়। হাফিজ নুরুন্নবী সাহেব ছিলেন উর্দু সাহিত্যিক, রুচিমান, পরিশীলিত, মার্জিত স্বভাবের মানুষ। নজরুল যেমন আকর্ষিত হয়েছিল এঁর নম্র ব্যক্তিত্বের দিকে, তেমনি তিনিও সম্ভবত তাঁর সৃষ্টিশীল মেধার জন্যে লক্ষ করে থাকবেন ছাত্রের মধ্যে কোনো প্রতিভার দ্যুতি। দীর্ঘকাল পরে, নজরুল কবি হিসেবে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর সামনেই কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদকে তিনি হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, "বেত হাতে তাড়া করে ওকে আমি আমার পারসীর ক্লাসে ধরে এনেছিলাম।" যে-ভাষার অক্ষরজ্ঞান হয়েছিল মক্তবে, চাচাজান বজলে করিমের কাছে, যা হয়তো সে এতদিনে ভুলেও গিয়েছিল, এতদিন

পরে সেটাই আবার মাজাঘষা করার সুযোগ পেল নজরুল এই ফার্সি পণ্ডিত ও উর্দু সাহিত্যিকের কাছে।

এই জ্ঞান তার বিফলে যায় নি।

৮

শিয়াড়শোল স্কুলে ছাত্রাবস্থাতেই পদ্য-লিখিয়ে হিসেবে নুরু সকলের চোখে পড়েছিল। যা ছিল গোপন সাধনা তাই অকস্মাৎ জানাজানি হয়ে গেল। মাষ্টারমশাইরা কেউ জানেন না যে তাঁদেরই এক ছাত্র কবিতা লেখে। স্কুলের শিক্ষক ভোলানাথ স্বর্ণকার স্কুল ছেড়ে চলে যাবেন। তাঁর বিদায়সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে। বিদায় উপলক্ষে একটা কবিতা পাওয়া গেলে ভালো হত। কিন্তু লিখবে কে? শিক্ষকদের বলা হল—উঁচু ক্লাসের ছেলেদের ভিতরে খোঁজ করে দেখুন, যদি কারো কবিতা লেখার বাতিক থাকে। ক্লাস নাইনের সেরা ছেলে নজরুল, ডবল প্রোমোশন পেয়ে উঠেছে, রচনা লেখার হাত খুব ভালো। তাকেও জিজ্ঞেস করা হল।

সে বলে—আমি খোঁজ দিতে পারি, স্যার; আমার বন্ধু শৈলজানন্দ, রায় সাহেবের নাতি, রাণীগঞ্জ স্কুলে পড়ে,—স্যার, ও খুব ভালো কবিতা লেখে, বললেই লিখে দেবে। স্যার তো ছুটলেন রায় সাহেবের বাড়িতে, রায় সাহেবের নাতির সঙ্গে দেখা করতে। শৈলই সব ফাঁস করে দেয়। বলে—কী কাণ্ড! স্যার নুরু তো নিজেই কবিতা লেখে, ভারি চমৎকার। ওর মাষ্টারমশাই, ওরই তো লেখা উচিত। তাতে ওরও সুনাম হবে, স্কুলেরও গৌরব বাড়বে। আমি অন্য স্কুলে পড়ি, আমি লিখে দিলে সেটা কি ভালো দেখায়?

শিক্ষকও বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা : বললেন, তা তো বটেই, কিন্তু ও তো বলল না। কী দুষ্টু দেখ দেখি, আমাকে শুধু শুধু এতটা পথ দৌড় করালে!

নিজেরই বুদ্ধির দোষে ধরা পড়ে যায় নুরু। ও চেয়েছিল বন্ধুকে ফাঁসাতে, এখন নিজেই ফেঁসে গেল। শৈলর নাম না বলে চুপ করে থাকলেই হত! বেকুবের মতো কেন বলতে গেল? যাক, এখন তো আর কোনো উপায় নেই, লিখতেই হয়। আসলে বড়ো বিনয়ী ও ভদ্র, বড়ো নিরহঙ্কারী লাজুক ছেলে। লেখা হল কবিতা, 'করুণ-গাথা'। আটচল্লিশ পঙ্‌ক্তির সুদীর্ঘ কবিতা, আট স্তবকে বিভক্ত, আর প্রতি স্তবকে আছে ছ'টি করে পঙ্‌ক্তি। কবিতাটির মধ্যে ভারি একটা মজা আছে। প্রতি স্তবকের প্রথম লাইনের প্রথম অক্ষর নিজের নামেরই একেকটা অক্ষর দিয়ে সাজিয়েছে সে। প্রথম থেকে অষ্টম স্তবকের প্রথম শব্দগুলো এই : নয়ন, জলদি, রুদ্ধ, ললাট, এতই, সকলই, লাবণ্য, মধু। শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর নাও, দেখবে বেরিয়ে আসছে ন-জ-রু-ল এ-স-লা-ম। কে জানে, নুরু হয়তো ঐ সময়ে নিজের নাম ও-ভাবেই লিখত। পরে যখন তার কবিতা-গল্প কাগজে ছাপা হতে শুরু করে তখন কোথাও 'এসলাম' দেখি না, সবখানেই ছাপা হয়েছে 'ইসলাম'।

এ রকম আরো একটি ফরমায়েশি কবিতা তাকে লিখতে হয়েছিল এই স্কুলে থাকতেই। স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সহকারী শিক্ষক হরিশঙ্কর মিশ্র। তাঁর বিদায়-

সংবর্ধনাতেও কবিতা লেখার ভার নুরুর কাঁধেই পড়ল। রচিত হল 'করুণ-বেহাগ' কবিতা। এটিও দীর্ঘ, ঊনচল্লিশ পঙ্‌ক্তির।

এদিকে একটা ঘটনা ঘটল রাণীগঞ্জ শহরে। মহা হৈ-চৈ কাণ্ড এক। বটগাছতলায় এক ফকির থাকতেন, একটা কথাও কখনো বলতেন না, যথার্থই মৌনী ফকির। এক দিন সেই ফকিরের ওপর দিয়ে গরুর গাড়ি চলে গেল। নজরুল তখন ক্লাস নাইনে পড়ছে। ফকির, মনে হয়, রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে ছিলেন, গাড়োয়ান দেখতে পায় নি। চাকা চলে গেল একেবারে বুকের ওপর দিয়ে। পাঁজর ভেঙে গেল, রক্তাক্ত ব্যাপার। লোক জমে গেল, পুলিশ এল। গাড়োয়ানকে বেঁধে রাখল একটা গাছের সঙ্গে, হাজতে চালান করে দেবে। ফকির তখনও মারা যান নি; ধুঁকছেন, প্রাণটা বেরিয়ে গেলেই হয় এমন অবস্থা। মৃত্যুশয্যাতেই ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেন—"এ তো সৌভাগ্য যে ঐ গাড়োয়ান এসে আমাকে ছুটি দিয়েছে, ও আমার মুক্তিদাতা। বাবা পুলিশ, তুমি এই দশটা টাকা নিয়ে ওকে ছেড়ে দাও।" পুলিশ তো কেঁদে আকুল। "আমি পুলিশ বলে কি এমনই পাষণ্ড! বাবা ফকির, আপনি যখন ক্ষমা করতে পারলেন তখন আমি কেন ওকে ধরে রাখব? পুলিশে চাকরি করি বলে কি এতই নীচ হয়ে গেছি যে আপনার হাত থেকে এ-জন্যে টাকা নেব?" ফকির বললেন—"তা হলে বাবা, টাকাটা গাড়োয়ানকেই দাও। ও বড়ো গরিব মানুষ।" মৌনী সাধুকে এই-ই প্রথম সবাই কথা বলতে শুনল। এ ক'টা কথা বলেই ফকির মারা গেলেন।

নজরুলের স্বচক্ষে দেখা প্রত্যক্ষ ঘটনা। পীর-ফকির সাধু-সন্ন্যাসীতে ভক্তি তার বরাবরই ছিল। ধর্মের আবহাওয়াতেই তার শৈশব কেটেছে তো! সমস্ত ঘটনা তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। সবটাই সে লিখে ফেলল কবিতার আকারে। নাম রাখল 'ক্ষমা'।

এটিই প্রথম প্রকাশিত কবিতা নজরুলের। ছাপা হয়েছিল রচিত হওয়ার চার বৎসর পরে। 'ক্ষমা' পরিবর্তিত হয়ে তখন নাম হয়েছিল 'মুক্তি'।

শিয়াড়শোল স্কুলে, রাণীগঞ্জে ছাত্রজীবন মন্দ কাটছে না। কোলাহলমুখর বন্ধনহীন দিন। পড়াশোনা চলছে, তবে তার চেয়ে বেশি সময় কেড়ে নিচ্ছে সাঁতার কাটা, এয়ারগানে পেঁপে শিকার, সঙ্গীতচর্চা, গল্প-কবিতা মক্‌শো করা। তারই মধ্যে এক দিন—

নজরুল সে-বছর ক্লাস টেনে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে। বিদ্যালয়-জীবনের সর্বশেষ, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। প্রি-টেস্ট কাছিয়ে আসছে। ক্লাসের ফার্স্ট বয় সে। শিক্ষকদের অনেক ভরসা তার ওপর—পরীক্ষায় নিশ্চয়ই ভালো করবে সে। তার নিজের আশাও কি কম? চুরুলিয়ায় পড়ে আছে দরিদ্র সংসার, তার পানে তাকিয়ে আছে মা-ভাই-বোন। দুখু একবার পাশ করে বেরুক, তা হলেই আর তাদের ভাবনা থাকবে না। ম্যাট্রিক পাস ছেলে, ভালো চাকরি-বাকরি নিশ্চয়ই জুটে যাবে, বাড়ির অবস্থাও তখন ফিরবে। কিন্তু—। সব ওলটপালট হয়ে গেল।

রাণীগঞ্জ স্টেশন দূরে নয়। ঘুরতে ঘুরতে সেদিন ওদিকে চলে গিয়েছিল নজরুল। দূরপাল্লার ট্রেন এসে থেমেছে। কামরা-ভর্তি লোক। এরা কারা? সব যে দেখি আমার বয়সী ছেলেপিলে! সবাই তরুণ। বয়েস কারুরই বেশি নয়। বলো ভাই বন্দে মাতরম্ হাঁক উঠল প্ল্যাটফর্ম থেকে, ট্রেনের কামরা থেকে। দেশমাতৃকার বন্দনা করি। দেশের জন্যেই যুদ্ধে যাচ্ছি।

তার মানে? এরা সবাই যুদ্ধে যাচ্ছে! এতক্ষণে বোঝা গেল। তাইতেই সকলে একবয়সী, বুড়ো-হাবড়া কোনো লোক নেই। লেখাপড়ার মতো যুদ্ধও তো একটা বিদ্যা, একটা শাস্ত্র—অনেক শেখবার আছে, জানবার আছে। যুদ্ধবিদ্যার কৌশল রপ্ত করে এসে এরাই একদিন ব্রিটিশদের তাড়াবে এদেশ থেকে। আহ, ভাবতেও আনন্দ! কিন্তু আমি—আমি নজরুল ইসলাম হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব নাকি? এয়ারগানের গুলিতে পেঁপে ফুটো করে বোকার মতো মনকে বোঝাব—লাটসাহেব খতম, পঞ্চম জর্জ খতম? ছিঃ, নজরুল! আর তোমার বসে থাকা সাজে না।

সময়টা ১৯১৭ সাল। ধুন্ধুমার লড়াই চলছে। সবাই বলছে—বিশ্বযুদ্ধ। মানে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ। কিন্তু বিশ্বের কারা লড়ছে, কোথায় লড়ছে, রাণীগঞ্জের লোক তার খবর রাখে না। আদার ব্যাপারি, জাহাজের খোঁজ কে রাখে! নিরক্ষর অর্ধশিক্ষিত, সাধারণ মানুষজন—অল্পেতেই তুষ্টি, অল্পেতেই শান্তি। অবশ্য এটা সবাই জানে যে, লড়াই চলছে ইংরেজ আর জার্মানদের মধ্যে। এও জানে যে, যুদ্ধটা বাংলা দেশে হচ্ছে না, ভারতের মাটিতেই হচ্ছে না আদৌ। হচ্ছে দূরে—অন্য কোনোখানে। তবে, হাজার হোক যুদ্ধ বলে কথা! অনেক, অ-নে-ক লোক লাগবে সেখানে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যাচ্ছে, বাঙালিদেরও যেতে হবে। রাণীগঞ্জেরও দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার পড়ল :

কে বলে বাঙালি যোদ্ধা নয়? কে বলে বাঙালি ভীতু? জাতির এই কলঙ্ক মোচন করা একান্ত কর্তব্য, আর তা পারে একমাত্র বাংলার যুবশক্তি। ঝাঁপিয়ে পড় সিংহবিক্রমে। বাঙালি পল্টনে যোগ দাও।

যোগ দেব তো বটেই। সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি হয় না নজরুলের। যুদ্ধে সে যাবেই। দলে টানে বন্ধু শৈলকেও। পড়ে রইল প্রি-টেস্ট, টেস্ট, ম্যাট্রিক পরীক্ষা। ভালো মানুষ নই গো মোরা, ভালো মানুষ নই। আমরা উদ্দাম, আমরা চঞ্চল। চল, যুদ্ধে চল। মনে মনে ভাবে—আমরা বাঙালিরা কিন্তু কম চালাক নই! তোমার শিল তোমার নোড়া, তোমারই ভাঙি দাঁতের গোড়া!

শুরু হল দৌড়ঝাঁপ। আসানসোল যেতে হবে। সদর মহকুমা যে! ওখানেই বসে মহকুমা হাকিম। পল্টনে নাম লেখাতে গেলে সাহেবের চিঠি চাই। গেল দু' বন্ধু মিলে। ইংরেজ সাহেব মহাখুশি! খস্‌খস্ করে চিঠি লিখে দিলেন। ব্যস্, কলকাতায় গিয়ে এই চিঠি দেখালেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। কে জানত এত সহজেই সব চুকবে! প্রাণের খুশি দু' বন্ধু আর ধরে রাখতে পারে না।

রাণীগঞ্জ ছোট্টো জায়গা। লোক বলে, দেয়ালেরও কান আছে। কথা চাপা থাকে না, জানাজানি হয়ে যায়, খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না। যুদ্ধে যাচ্ছে শৈল আর নুরু। রাণীগঞ্জ স্কুলের এক জন, আর শিয়াড়শোল রাজ হাই স্কুলের এক জন—দু' জনেই পড়ে ক্লাস টেনে। বলে কী ছেলে দুটো? প্রাণের মায়া কি এতটুকু নেই! এমনি ডাকাবুকো! যুদ্ধে গেলে কেউ ফিরে আসে কখনো! বন্ধুবান্ধবেরা কান্নাকাটি করল! অন্যেরা বোঝাল। ওদিকে শৈলর বাড়িতে তো দক্ষযজ্ঞ লেগে গেছে—তার নানা প্রবল প্রতাপান্বিত রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে তুলকালাম চলছে। মা-মরা ছেলেটা শেষকালে যুদ্ধে যাবে মরার জন্যে? আর বাড়ির সবাই তা দেখবে তাকিয়ে-তাকিয়ে? শৈল বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আর নজরুল তো সময়ই পেল না একবার চুরুলিয়া ঘুরে আসার। মনে তারও ভয় ছিল কিনা কে বলবে? মা যদি কান্নাকাটি করে আসতে না দেয়! মা-ভাই-

www.alorpathsala.org

বোন, বজলে করিম চাচা—কারুর সঙ্গেই আর দেখা করা হল না।

হে চুরুলিয়া, বিদায়! হে রাণীগঞ্জ, বিদায়! বিদায় হে শৈশব হে কৈশোর! তোমাদেরই দুই ছেলে বিশ্বজয়ে বেরুচ্ছে। তোমাদেরই মুখ উজ্জ্বল করবে ওরা। দেখো, ওরা ঠিকই ফিরে আসবে, এখন প্রসন্ন মনে বিদায় দাও।

পরবর্তী কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। ট্রেনে চেপে কলকাতা যাওয়া এই প্রথম। শৈল অবশ্য পূর্বেও এসেছে দু-এক বার, এখানে ওর মামারা আছেন। নজরুলকে বলে, নয়ন মেলে ভালো করে দেখে নাও। যাচ্ছি তো যুদ্ধে, কপালে ফের কলকাতা দেখা আছে কিনা কে জানে! নজরুলের মনে কোনো দুশ্চিন্তা নেই, বুকে আশার কোনো কমতি নেই। বলে—যাঃ, কী যে বলিস, ঠিক ফিরে আসব। সকালে নেমে প্রথমেই শৈলর মামাবাড়ি যাওয়া। তারপর বিকেল বেলা রিক্রুটিং অফিস। এস-ডি-ওর চিঠিই তো বিরাট সার্টিফিকেট। ভাবনা কি! তবু বাদ পড়ে যায় শৈল। কী কলকাঠিই যে নেড়েছিলেন রায়বাহাদুর তাঁর এই নাতিটির জন্যে! স্বাস্থ্যপরীক্ষার সময়েই ফেল! শৈলর বুকের ছাতি নাকি অতটা চওড়া নয় যতটা দরকার।

নজরুলকে ভর্তি করে নেওয়া হল ঊনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেণ্টে। ইংরেজিতে বলা হত 49th Bengalis, বাংলায় সহজ করে বলা হত, সংক্ষেপে, 'বেঙ্গলি রেজিমেণ্ট'। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল দু' বন্ধুর। মামার হাত ধরে কান্না চেপে বাড়ি ফিরল শৈল। আর তাকে পাঠানো হল ছাউনিতে, কলকাতা শহরেরই বুকে ফোর্ট উইলিয়ম নামের দুর্গে। এর পর দিন কয়েকের ভিতরেই লাহোর, সেখান থেকে পেশোয়ার, সেখান থেকে নৌশেরা। পেশোয়ার জেলারই মহকুমা-শহর নৌশেরা, সেখানেই ট্রেনিং দেওয়া হবে।

দুখু মিঞা আর নুরুর গল্প এখানেই শেষ হল। শেষ হল কবি নজরুলের জীবনের প্রথম পর্ব। আঠারো বছরের চঞ্চল জীবনের আর সময় নেই পিছন ফিরে তাকানোর। সম্মুখে আদিগন্ত মহাজীবন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

৯

এই জীবনই তো চেয়েছিল নজরুল। ঝড়ো হাওয়ার উদ্দাম অশান্ত জীবন। বন্ধু শৈলজানন্দকে হারিয়ে মন যেটুকু খারাপ হয়েছিল নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশে পা দিয়ে কোথায় তা মিলিয়ে গেল। হৈ-চৈ, উত্তেজনা, সাজসাজ রব ফোর্ট উইলিয়মে। নজরুল তো একা নয়, জড়ো হয়েছে আরো কত ছেলে। আলাপ-পরিচয় সাঙ্গ হতে-হতেই কেটে গেল ক'টা দিন। উপরন্তু রয়েছে অদূরাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা। যুদ্ধের ট্রেনিং—সে কেমন? যুদ্ধই-বা কেমন? কেউ তো আর যুদ্ধ দেখে নি, শুধু গল্পই শুনে এসেছে এতকাল। সহপাঠী, সমমর্মী, দুঃখসুখের বন্ধু শৈলজানন্দের স্মৃতি আর নজরুলকে কাঁদায় না।

নির্ধারিত সময়ে দলবলের সঙ্গে নৌশেরা পৌঁছেছিলেন নজরুল। পথের অভিজ্ঞতাই কি কম! কলকাতা থেকে ট্রেন ছাড়বে। স্টেশন লোকে লোকারণ্য। লোকজন ছুটে এসেছে

বিদায় জানাতে নওজওয়ান সৈনিকদের। দেশের সন্তানদের জন্যে তাদের চোখেমুখে গর্ব, কণ্ঠে উল্লাস। বাঙালির মান বাঁচিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে মায়ের বুকে আবার ফিরে এসো! বিদায় দেয় তারা ভালোবাসার অশ্রুতে চোখ মুছতে মুছতে। শুধু কি কলকাতায়? লাহোরেও একই কাণ্ড। বাঙালির গর্ব, বাঙালি নারীর সম্পদ সরলা দেবী চৌধুরানী আছেন লাহোরে। মেয়ে না বলে ছেলে বলাই ভালো! ছেলেদের হার মানিয়ে দেয় এমনই জ্ঞানবুদ্ধি, লেখাপড়া আর সাহস। বাংলার বিপ্লবীদের মস্ত বড়ো আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতনী, রবীন্দ্রনাথের দিদি ঔপন্যাসিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে। ইনিও ছিলেন সুলেখিকা, সুগায়িকা। এঁর লেখা আত্মজীবনী "জীবনের ঝরাপাতা" অসম্ভব সুন্দর বই! একবার পড়া শুরু করলে শেষ না-হওয়া পর্যন্ত ছাড়তে পারবে না—দেশবরেণ্য কত লোক, কী বিচিত্র তাঁদের কর্মধারা; স্বদেশী যুগটা একেবারে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাবে। ইংরেজিতে বি. এ. অনার্স পাশ, সংস্কৃতে এম. এ. পড়তে-পড়তে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। স্বদেশী যুগের মন্ত্রে জীবন উৎসর্গ করে দিলেন। তাঁর একটি গান তো সেকালে লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। যেমন উদাত্ত সুর, তেমনি গানের বাণী :

অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী
গাও আজি হিন্দুস্থান!
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান!
হর হর হর—জয় হিন্দুস্থান!
সৎশ্রী অকাল হিন্দুস্থান!
আল্লা হো আকবর—হিন্দুস্থান!
নমো হিন্দুস্থান!

নজরুলের পক্ষেও এই গান শুনে থাকা অসম্ভব কিছু নয়, যুগের হাওয়ায় ঐ গান তখন ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই সরলা দেবী অভ্যর্থনা জানাতেন বাঙালি জওয়ানদের, যখনই কোনো ট্রেনে তারা লাহোর এসে পৌঁছুত। তরুণদের মনে সাহস ও উন্মাদনা জাগানোর উদ্দেশ্যে গানও রচিত হয়েছিল :

আজু তল্‌ওয়ার সে খেলেঙ্গে হোরি
জমা হো গেয়ে দুনিয়া কে সিপাঈ।
ঢালোঁও কি ডঙ্কা বাদন লাগি,
তোপোঁও কে পিচকারি,
গোলা বারুদ কা রঙ্গ্ বনি হেয়
লাগি হেয় ভারী লড়াঈ।

আজ আমি তরবারি দিয়ে হোলি খেলব, সারা দুনিয়ার সেপাই আমরা জমায়েত হয়েছি। ঢালের ঝঞ্ঝনার আওয়াজ উঠছে, কামানের গোলা দিয়ে পিচকারি খেলা, গোলা-বারুদ নিয়ে রং তামাসা হচ্ছে—লড়াই লেগেছে দারুণ। কী উদ্দীপনাময় এমন সংবর্ধনা! এ-হেন সাহসসঞ্চারী বরাভয় আর আশীর্বাণী শুনতে-শুনতে নৌশেরা পৌঁছেছিলেন নজরুল।

নৌশেরায় ট্রেনিং চলেছিল প্রায় তিন মাস। বন্ধু শৈলজানন্দকে চিঠিতে লিখলেন—খুব ভালো হয়েছে যে তুমি আস নি, এত কষ্ট আর পরিশ্রম তুমি সইতে পারতে না।

ট্রেনিংশেষে বদলি করে দেওয়া হল বন্দর-শহর করাচিতে। ক্যান্টনমেণ্ট এলাকায় মারহাট্টা লাইন। নৌশেরার দলকে প্রথমে এখানেই তোলা হয়। জায়গাটা ব্রিগেড গ্রাউণ্ডের পাশে। স্থান সংকুলানে অসুবিধে হওয়ায় নতুন ছাউনি তৈরির কাজ শুরু হল বেরিয়েল গ্রাউণ্ড বা কবরস্থানের কাছে। মাটির দেয়াল, মাটির মেঝে, উপরে চাটাইয়ের আচ্ছাদনের ওপর মাটি দিয়ে তৈরি ছাদ। এই হচ্ছে গাজা লাইন। মারাঠা লাইন থেকে চালান করে দেওয়া হল এখানে, গাজা লাইনে। নজরুলও আছেন দলের সঙ্গে। এটাই স্থায়ী ব্যবস্থা, আর নড়চড় নেই। এরপর থেকে যতদিন পল্টনে ছিলেন ততদিন এখানেই সময় কাটিয়েছেন।

কীভাবে তাঁর সময় কাটত বন্ধু ও স্বজনরহিত সেই দূরদেশে? নজরুল কোনো আত্মজীবনী লিখে যান নি, নিজেকে কেন্দ্র করে কোনো রচনা তাঁর নেই। ঐ জীবনের ছবি আছে তাঁর লেখা দু-একটা চিঠিতে, কখনো-বা আড্ডার আসরে পরবর্তীকালে গল্প করেছেন কোথাও। আর আছে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের লেখা রচনার ভিতরে। স্কুলজীবনে যেমন ভালো ছাত্র ছিলেন তেমনি সৈনিকজীবনেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ব্যাটালিয়ান-মাস্টার হাবিলদার—এই পদে যেতে তাঁর খুব বেশি সময় লাগে নি। মাঝখানের দুটি ধাপ ল্যান্সনায়েক ও হাবিলদার পদে যোগ্যতা ও কৃতিত্ব দেখিয়েই উচ্চতর পদে নিযুক্ত হতে পেরেছিলেন।

সৈনিকের জীবন, আগেই বলেছি, কষ্টের। প্রতি মুহূর্ত নিয়ন্ত্রণে বাঁধা! কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদকে এখান থেকেই চিঠি লিখেছিলেন কলকাতায় দু' বছর পরে। তাতে পাই রুদ্ধশ্বাস ব্যস্ততার ছবি :

> ...সৈনিকের বড্ড কষ্টের জীবন। আর তার চেয়ে হাজার গুণ পরিশ্রম করে একটু আধট লিখি। আর কারুর কাছে ও একেবারে worthless হলেও আমার নিজের কাছে ওর অনেক দাম ভয়ানক।...আমাদের এখানে সময়ের money-value; সুতরাং লেখা সর্বাঙ্গসুন্দর হতেই পারে না। undisturbed time মোটেই পাই না। আমি কোন কিছুরই কপি duplicate রাখতে পারি না। সেটি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সবই ঠিক। সৈনিকের জীবন কঠিন নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা, শারীরিক শ্রমের অন্ত নেই। তবু এরই ফাঁকে তিনি সময় বের করে নেন বই পড়ার, কবিতা-গল্প-উপন্যাস রচনার, গানবাজনা করার। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শম্ভু রায়, পল্টন-জীবনের বন্ধু—একসঙ্গেই চাকরিতে ঢুকেছিলেন এবং একই সঙ্গে বেরিয়েও এসেছিলেন। ইনি ছিলেন জমাদার ডিসিপ্লিন-ইন-চার্জ, অর্থাৎ প্রশিক্ষণরত সেনাদের আইন-শৃঙ্খলার রক্ষাকর্তা। তিনি সেই সময়ের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। দীর্ঘ বর্ণনা, কিন্তু অবিকল ছবিটি ধরা পড়েছে :

> ...পল্টনে যেদিন কাজী যায় সেদিন থেকে আরম্ভ করে পল্টন থেকে যে দিন আমি চলে আসি সেদিন পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। অবশ্য কাজীর উদার প্রাণে ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে তোলা কারও পক্ষেই অসম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ তখন আমরা সবাই জুটেছি গুলীবারুদের মুখে প্রাণ দিতে। পিছনে তাকাবার সময় ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না।
>
> নিজেরা সব মিলতাম ব্রজের রাখাল বালকের মত। কাজীর পড়াশোনার প্রতি বেশ প্রীতি ছিল! রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত পুস্তকই ও শরৎচন্দ্রের সব লেখাই কাজীর কাছে ছিল। তা'ছাড়া মাসিক পত্রিকাদি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী, সবুজ [পত্র] পত্রিকাদি প্রভৃতি সবই কাজী রাখত। এ ছাড়াও কাজীর কাছে দেখেছিলাম Seditious

Committee-র Report. এ দেখে বুঝতাম কাজী বিদ্রোহী বাঙলার বিপ্লবী দলকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। হাসি আনন্দ ছিল তার সম্বল। পল্টনের প্রায় ৭০০০ বাঙালির মধ্যে নানা শ্রেণীর ও নানা প্রকৃতির মানুষ ছিল। গাইয়ে বাজিয়ের সংখ্যাও কম ছিল না। আমাদের Folding table, harmonium থেকে আরম্ভ করে Banjo, Clarionate, Coronate, বেহালা প্রভৃতি সকল রকমের গীতবাদ্যাদির জন্য যন্ত্র পল্টনকে সরবরাহ করা হয়েছিল। গাইয়ের, বাজিয়েরও অভাব হয় নি। বেশ ভাল ভাল গাইয়ে বাজিয়েরাও পল্টনে যোগদান করেছিল। এঁরা প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যায়ই কাজীর ঘরের সম্মুখে বসে দারুণভাবে গান বাজনা চালাতেন।...

... ...

পল্টনের Committee-র দরুন Harold এর বাড়ির Folding Organটি কাজীর ঘরেই থাকত। কাজীর হারমোনিয়াম বাজনা ও গান শিক্ষার প্রাথমিক ঠিকানাও ওখানে।...

কাজীকে Organ বাজনার শিক্ষা দেন হুগলীর ঘুটিয়াবাজারের হাবিলদার নিত্যানন্দ দে।

পল্টনে এই সময়ে মনিরুদ্দিন আহমদ নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন কোয়ার্টার-মাস্টার জমাদার। নজরুল তো সর্বজনপ্রিয়, সদানন্দ। ইনিই নজরুলকে নিজের স্টাফের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন ল্যান্সনায়েক করে; পরে এখানেই নজরুল হাবিলদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। কোয়ার্টার-মাস্টারের স্টাফ হওয়ায় বরং অনেক লাভ হল। এই চাকুরিতে নিত্যকার প্যারেড নেই, গার্ডের ডিউটি দিতে হবে না, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওপরওয়ালার কাছে হাজিরা দেবার বালাই নেই। এখন তা হলে কাজ কী? কাজ—টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে থেকে অফিস করা। তাঁদের বাহিনীতে যত জওয়ান আছে তাদের সামরিক পোশাকআশাক ও ব্যবহার্য দ্রব্যের তদারকি করা। অর্থাৎ কোট, পাৎলুন, জামা, গেঞ্জি, বুট জুতো, পট্টি মোজা, গায়ে দেওয়ার কম্বল ইত্যাদি থরে থরে সাজিয়ে চুপচাপ বসে থাকা। যার যখন যা দরকার তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাবে। অন্য কথায়, এতদিন যা মনে মনে কামনা করে আসছেন সেই মূল্যবান অবসর তাঁর হাতের মুঠোয় এসে গেল। এবার কোথাও তাঁর হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা—চিন্তা করার সময় মিলল, লেখা ও পড়ার অবসর, গান-বাজনা করারও। নজরুল এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

তা ছাড়া ভাগ্যও সুপ্রসন্ন বলতে হবে। এক পাঞ্জাবি মৌলানা ছিলেন ছাউনিতে। ফার্সি ভাষায় অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন ও কাব্যরসিক মানুষ ছিলেন। ফলে নতুন করে ফার্সি ভাষা চর্চার সুযোগ মিলে গেল। ফার্সি কবিতা পাঠ ও কাব্যরস আস্বাদনের নিয়মকানুন মৌলানা সাহেব তাঁর এই বাঙালি ছাত্রকে শেখাতে লাগলেন। নজরুল যে পরে সরাসরি ফার্সি ভাষা থেকে ওমর খৈয়াম ও হাফিজ অনুবাদ করতে পেরেছিলেন তার ভিত্তি এখানেই রচিত হয়। রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ কাব্যানুবাদের ভূমিকায় নজরুল স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে :

> আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজী ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালি পল্টনে এক জন পাঞ্জাবী মৌলবী থাকতেন। এক দিন তিনি দিওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। শুনে আমি এম্‌নি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি! তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।

শুধু ফার্সিই ভালো ভাবে শেখা নয়, উর্দু ও হিন্দিও তিনি শেখার সুযোগ পান এই সেনাজীবনেই। ভারতের সব স্থান থেকেই লোকজন গিয়েছিল সেখানে—উর্দুভাষী,

হিন্দিভাষী; তাই ভাষা শিখতে কোনো অসুবিধেই হয় নি।

পল্টন-জীবন এভাবে কাটছে। সব কিছুই চলছে একসঙ্গে : রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পাঠ, কলকাতা থেকে আনানো পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে দূর মাতৃভূমির সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখা, ফার্সি শেখা, নিজের সাহিত্য রচনা, গানবাজনা করা। পূর্বের মতো এখনো সময়ের নাগাল মেলে না, হু-হু করে উড়ে যাচ্ছে সময়। তফাৎ কেবল এটুকুই—তখন সবটুকু সময় কেড়ে নিত কায়িক পরিশ্রম, আর এখন মেধার চর্চা; আগে ছিল শুধুই দায়িত্ব ও কর্তব্য, তার সঙ্গে এবারে যুক্ত হল আনন্দ। খাতার পাতা ভরে উঠছে একের পর এক। কত লেখা নিজেরই মনঃপূত হচ্ছে না, ছিঁড়ে ফেলে দিতে হচ্ছে। অন্য লোককে শোনাব কি, পড়াবই-বা কি—আগে তো নিজের তৃপ্তি আসা চাই।

পল্টনে কাব্যচর্চার সুন্দর ছবি রচনা করেছেন এক কবিতায়। পরিহাসে উজ্জ্বল, অথচ অসহায় কবির কেমন চেহারা ফুটে উঠেছে, দেখ।

পরিশ্রমে গলদ্‌ঘর্ম সারা নিশি জেগে'
ভাব-শিরে মুহুর্মুহু লাঠ্যাঘাতি' রেগে'
সে কি লেখা লিখিলাম মহা মহা পদ্য,
অক্ষর একুন করি' যোজিলাম চৌদ্দ।
মৃচ্ছকটিক আর শব্দসার ভ্রমি'
আনিলাম কাব্য এক শব্দকল্পদ্রুমি!
রচিলাম কি বিকট শব্দ বাছি' বাছি',
জাহাজে বেঁধেছে যেন শত শক্ত কাছি।
কবিদের ভাব সব 'না-বলিয়া-নিয়া'
সাহিত্য-আসরে এনু গুম্ফ আস্ফালিয়া!
এ লেখা কি ব্যর্থ হয়? তবে নাম মিছে!
"বাঃ ভাই"—বন্ধুরা কয় দন্ত-সংঘ খিচে'।
চাটু-বাক্যে লুব্ধ হয়ে কবিতারাশিকে
পাঠালাম ছোট বড় সকল মাসিকে।
সম্পাদক অভদ্র সে না দেয় উত্তর;
বিষম রুখিয়া শেষে লিখিনু, "দুত্তোর!
টিকিট খেয়েছ মম,—যেতে দাও; এবে
হে ভদ্র, কবিতাগুলি ফিরিয়ে কি দেবে?"
শেষে সে সহস্র-পত্র লেখার দরুন
'রিপ্লাই' আসিল ওহো, ভীষণ করুণ! —
"অবশ্য, কিছুও তার পাই যদি ঘেঁটে
কবিতা-সমাধি-বৎ পেপার-বাস্কেটে!!"

না, ব্যাপারটা ঠিক এতখানি করুণ, এতদূর নিষ্ঠুর ছিল না। এ কেবলই নিজেকে নিয়ে রঙ্গ করা! কেননা কলকাতায় যা-ই তিনি পাঠিয়েছেন তাই ছাপা হয়েছে। কেউ ফিরিয়ে দেয় নি, কেউ ময়লার ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নি। সে-গল্প পরে আসছি। তার আগে সাঙ্গ হোক ছাউনির জীবন, প্রবাসী ফিরে যাক তার ঘরে।

সৈনিক জীবনে ছুটিছাটা এমনিতেই কম। ১৯১৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। বাঙালি ছেলেদের সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয়েছিল এই বিশ্বযুদ্ধে লড়বার জন্যেই।

যুদ্ধ তো শেষ হল, এখন তা হলে কী? পরের ভাবনা পরে হবে, যার দায়িত্ব সে ভাববে। আপাতত হাবিলদার সাহেব তো ছুটি নিন! ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে দিন কয়েকের ছুটি নিলেন নজরুল। মাত্র সাত দিনের ছুটি : এর মধ্যে তিন দিন কাটবে কলকাতায়, চার দিন চুরুলিয়ায়।

শৈলজানন্দকে পূর্বেই জানিয়েছিলেন যে ছুটি নিয়ে দিন কয়েকের জন্যে তিনি দেশে আসবেন, বন্ধু কলকাতায় থাকলে তার সঙ্গেই থাকবেন। তারপর—

> ..হঠাৎ এক দিন সন্ধ্যায় দেখি, এক রিক্সায় চড়ে নজরুল এসে হাজির! চমৎকার চেহারা হয়েছে নজরুলের। মাথায় চুল রেখেছে, বুকের ছাতি হয়েছে ছওড়া, পায়ে বুট জুতো, খাকি প্যাণ্ট, খাকি সার্ট, —মানিয়েছে সুন্দর। পাশ বালিশের মত একটা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দোতলায় উঠে এলো।...কত কথা শুনলাম। কত কথা বললাম। একসঙ্গে গঙ্গায় স্নান করলাম। পাশের বাড়ি থেকে একটা হারমোনিয়াম চেয়ে এনে তার গান শুনলাম। ট্রামে চড়ে সারা কলকাতা চষে বেড়ালাম।...গেলাম ৩২, কলেজ স্ট্রীটের দোতলায়, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার আপিসে।...তিনটি মাত্র দিন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে এলাম নজরুলকে। আবার কতদিন পরে দেখা হবে কে জানে।

১০

বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্তই ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত নিয়েছিল। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধের প্রয়োজনে সাময়িকভাবে তৈরি এই বাহিনীও শেষ। সেনা-জীবনের পাট চুকিয়ে নজরুল চলে এলেন কলকাতায়, মাস দুয়েক পরেই, ১৯২০ সালের মার্চ মাসে। বাংলা সাহিত্যে, এদেশের সাংবাদিক জগতে, বাংলা গানে ঝটিকার বেগে এক আগন্তুক এসে প্রবেশ করলেন। এরপর উদ্দাম হাওয়ায় উড়বে জীবন, বেসামাল হবে পরিপার্শ্ব, সংসার।

নজরুলের যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের ইতিহাস সেই টালমাটাল কাহিনী। সব্যসাচীর মতোই হাল ধরে আছেন নতুন যুগের কবিতার, নতুন সময়ের রাজনীতি-সাংবাদিকতার, নতুন কালের বিদ্রোহ ও আবেগের, নতুন বাংলা গানের।

কাজী নজরুল ইসলাম যাঁর নাম সেই অপরাজের ব্যক্তিত্বের উদয় ও অস্ত বাঙালি জাতি প্রত্যক্ষ করেছিল এই সময়ে। বাইশ বৎসর ধরে।

নজরুলের কলকাতায় এসে থিতু হয়ে বসার ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে। গাঁয়ের ছেলে কলকাতা দেখে নি, চলে গেল পল্টনে। ফিরে এসে ইচ্ছে হলেই-বা কলকাতায় থাকে কার কাছে! এখানে তো কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। থাকার বলতে আছে একমাত্র বন্ধু শৈলজানন্দ। রায়বাহাদুরের নাতি, ভাগ্যচক্রে এখন খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের দলে—শর্টহ্যাণ্ড টাইপিং শিখছেন, কেবল গল্প লিখে যে পেট ভরে না, চাকরিবাকরি জোটাতেই হবে, এ তারই প্রস্তুতি। কিন্তু না, কেবল বাল্যের বন্ধুই নয়, ছিলেন আরো এক

জন। যতটুকু পরিচয় ও জানাশোনা থাকলে একজনকে বন্ধু বলা চলে, অতখানি পরিচয়ই হয় নি, তবুও এই মানুষটি বড় ভরসাস্থল।

লোকটি কে? কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ। কমরেড কেন? বাঙালি মুসলমান ছেলেদের ইংরেজি নাম আবার হল কবে থেকে? না, না, ওটা নামের অংশ নয়। ওটা বিশেষণ। শুধু মুজফ্‌ফর আহমদ বাংলা দেশে কয়েক লক্ষ থাকতে পারে, কিন্তু কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ আছেন এক জন, শুধুই এক জন। কমরেড মানে—বন্ধু। শুধু চেনা-জানাশোনার বন্ধুত্ব নয়; দীর্ঘ দিনের বাল্য-কৈশোরের সখ্যও কেবল নয়; এমনকি অজানা অপরিচিতেরও বন্ধু। তোমাকে আমার ব্যক্তিগতভাবে চেনার প্রয়োজন নেই, জানার দরকার নেই। যদি তুমি দুঃখী মানুষ হও তা হলেই তুমি আমার বুকের কাছের মানুষ। আমি তোমাকে বোঝাব, সাহস দেব, বুদ্ধি জোগাব যাতে তুমি হাল ছেড়ে না দাও, হতাশ না হও, ভেঙে না-পড়—এই হচ্ছে কমরেড মুজফ্‌ফর। রোগা-পাতলা ছোটখাটো মানুষ, হাঁপানির রুগী, অর্থাৎ শরীরটা এমনই যে গ্রাহ্য করবার কোনো ব্যাপারই নয়। সেই শরীরেরই ভিতরে ধুকপুক করছে একটি প্রাণ, হৃদয় ও মেধা—তাকে দমানোও যায় না, নোয়ানোও যায় না, বিভ্রান্তও করা যায় না। পুববাংলার উত্তাল বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে জন্মেছেন, বাড়ি সন্দ্বীপে। তবে সন্দ্বীপের লোক তিনি নামেই, জীবনের প্রায় সবটুকু তো বাইরেই কাটল! তারও বেশির ভাগ আবার কারাগারে, নয়তো লোকচক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞাতবাসে, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে—সরকার টের পেলেই ফের জেলে পুরবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন এঁর হাতে। জীবনভর সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন। সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন। এমন দেশ চাই যেখানে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ থাকবে না, কেউ কাউকে শোষণ করবে না। তার জন্যেই কৃষক শ্রমিক মজুরদের সংঘবদ্ধ করে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, ধর্মঘট করেছেন, শোষিত ও বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেছেন।

নজরুল যখন পল্টনে, কমরেড মুজফ্‌ফর তখন কলকাতায়। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি নামে একটি সংঘ বা দল গঠিত হয়েছে। সমিতির মূল উদ্দেশ্য বাঙালি মুসলিম সমাজকে আলোকিত করা, দীক্ষিত করা আধুনিক চিন্তাধারায়, ধর্মের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করা এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি দৃঢ়তর করা, উভয় সমাজের মধ্যে পারস্পরিক চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করা। সমিতির পক্ষ থেকে ত্রৈমাসিক পত্রিকা বেরুচ্ছে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'। দু' জন সম্পাদকের এক জন মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। অন্য জন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। ইনিই পরে দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক রূপে বাংলাদেশে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন, যাঁকে সবাই একডাকে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ নামে চেনে। এতদ্ব্যতীত ছিলেন একজন সহযোগী সম্পাদক : মুজফ্‌ফর আহমদ। তিনিই আবার পত্রিকার প্রকাশকও। প্রকৃতপক্ষে রচনা নির্বাচন করা থেকে ছাপা, বাঁধাইয়ের কাজ তদারকি করা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম ইনিই সম্পাদন করতেন।

করাচি থেকে কবিতা এসেছে এক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের। নজরুল তখন ঐভাবেই নিজের নাম লিখতেন। কবিতার নাম 'ক্ষমা'। সেই যে মৌনী ফকিরের মৃত্যু নিয়ে লেখা কবিতা, রাণীগঞ্জে থাকতে—সেই কবিতাটি। পড়ে ভালো লাগল, কিন্তু শিরোনাম ভালো লাগছে না—ঠিক আছে, করে দিলুম 'মুক্তি'। এটাই নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা। ছাপলেন মুজফ্‌ফর আহমদ, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়। সেই সূত্রেই পত্রের মাধ্যমে আলাপ-পরিচয়। চাক্ষুষ দেখা হল সপ্তাহখানেকের ছুটি কাটাতে

এসে নজরুল যখন তিন দিন কলকাতায় রইলেন, তখন। চমৎকার লিখেছেন মুজফ্‌ফর আহমদ :

> হাঁ, কাজী নজরুল ইসলামকে সেদিন আমি প্রথম দেখলাম। সে তখন একুশ বছরের যৌবনদীপ্ত যুবক। সুগঠিত তার দেহ আর অপরিমেয় তার স্বাস্থ্য। কথায় কথায় তার প্রাণখোলা হাসি। তাকে দেখলে, তার সঙ্গে কথা বললে যে-কোন লোক তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারত না। আমার সঙ্গে তার অনেক কথা হলো। যে-সব কথা আগে চিঠি-পত্রের মারফত হয়েছে সে-সব কথা আবারও হলো। তাকে আমি কলকাতায় এসে থাকতে বললাম। সাহিত্য সমিতির ঘরগুলি তাকে দেখিয়ে দিলাম। বললাম, এখানেই তার থাকার জায়গা হবে। উনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট তখন ভাঙনের মুখে। হয়তো দু'এক সপ্তাহের ভিতরেই তার ভাঙন শুরু হয়ে যাবে এই রকম ছিল তার অবস্থা। আমি নজরুল ইসলামকে বলে দিলাম রেলওয়ে স্টেশন হতে সে যেন সোজা সাহিত্য সমিতির অফিসে চলে আসে।

কলকাতায় শৈলজানন্দ যদি না থাকেন 'আহমদ সাহেব' তো আছেন। কমরেড মুজফ্‌ফরকে বরাবার এই নামেই সম্বোধন করতেন নজরুল। পল্টন জীবন শেষ করে নজরুল কিন্তু প্রথমে সাহিত্য সমিতির বাড়িতে এসে ওঠেন নি, কারণ শৈলজানন্দ তখন কলকাতাতেই। মেসে থাকেন শৈলজানন্দ; আস্তানা এক জনের, তবু অভিন্নহৃদয় বন্ধুর স্থান-সংকুলান তাতেই হয়ে গেল। অবশ্য দীর্ঘদিন থাকা সেখানে চলল না, এমন একটা ঘটনা ঘটল যে দু' বন্ধুই পথে এসে নামলেন। আপাতত এক আত্মীয়ের বাড়িতে গেলেন এক জন, আর অন্য জন গেলেন ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীট—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে, কমরেড মুজফ্‌ফরের কাছে।

মেসের ঘটনাটি এমন কিছু নয়, তথাপি আমাদের জানা প্রয়োজন; কারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ সম্বন্ধে তা আমাদের চোখ খুলে দেয়। ঐ মেস ছিল হিন্দু মেস,অর্থাৎ যাঁরা থাকতেন তাঁরা সকলেই হিন্দু। নজরুলের যে ওখানে থাকা ঠিক হবে না, এমন কোনো চিন্তা তাঁদের দু' জনের কারুর মাথাতেই আসে নি। আসে নি যে তার কারণ, যে-কোনো রুচিশীল উন্নতমনা মুক্তবুদ্ধির মানুষের মতো এঁদের মনেও ভেদাভেদ কখনো স্থান পায় নি। শৈলজানন্দেরও যদি ঘুণাক্ষরেও মনে হত যে কিছু অঘটন ঘটতে পারে তা হলে হয়তো বন্ধুকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতেন—নুরু, আপাতত তোর একটা হিন্দু নাম হয়ে যাক; বজ্জাতগুলো ধর্ম জানে না, কেবল ধর্মের সাইনবোর্ড চেনে। কিন্তু কোনো সন্দেহ বা আশঙ্কাই মনে আসে নি তাঁর। দু' বন্ধুতে কী তুমুল আড্ডা! নজরুলের ছাদ-ফাটানো অট্টহাসি, আর সেইসঙ্গে চলছে গানের ফুলঝুরি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসছে চা, পান, জর্দা। সেই মহোৎসবে যোগ দিচ্ছে মেসের বাসিন্দারাও। শৈলজানন্দ থেকে থেকেই ডাক দিচ্ছেন বন্ধুকে—নুরু, তারপর কী হল বল; আচ্ছা ঐ গানটা আরেক বার গা তো; নুরু, তুই এত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখলি কী করে বলতে পারিস? তোর কি রবীন্দ্রনাথের সব গান মুখস্থ? এমনি হাজারো কথা। 'নুরু'—সে আবার কে? মানে ছেলেটা মুসলমান নাকি? হিন্দুদের তো অমন নাম হয় না! হঠাৎ চার দেয়ালের ভিত নড়ে ওঠে, পায়ের তলার মাটি সরে যায় অন্যদের। চললো গুজগাজ ফুসফাস। এক দিন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন শৈলজানন্দ যে, মেসের চাকর ছেলেটা নজরুলের এঁটো বাসন-পেয়ালা ধোয় নি। নিজেই ধুতে লাগলেন। কোনো বিরাগ বা বিতৃষ্ণা নেই, বন্ধুর জন্যে পরিশ্রম করতে পারাতেও আনন্দ। শুধু ভয় একটাই—পাছে

নজরুল জেনে ফেলেন! কী দুঃখটাই তখন পাবে ও! মেসে আর এক মুহূর্তও থাকার ইচ্ছে নেই শৈলজানন্দের, অথচ বন্ধুকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে ওঠার মতো আস্তানাও নেই। আর অন্য কোথাও নুরুকে চলে যেতে বলে নিজে থেকে যাওয়া—এ শুধু অসম্ভবই নয়, চিন্তা পর্যন্ত মাথায় আসে না। তবু শেষ রক্ষা হল না। মেসের ম্যানেজার ডেকে পাঠালেন। শৈলজানন্দ গিয়ে দেখেন নাটের গুরু সবাই হাজির, ছেঁকে ধরেছে ম্যানেজারকে, একটা বিহিত করতে হবে। কিসের এত চেঁচামেচি? নজরুল মেসে থাকায় খাওয়াদাওয়া করায় সকলের জাত-ধর্ম নাকি চলে যাচ্ছে। অতএব এক্ষুনি বন্ধু ভাগাও আর অত ভালোবাসা থাকলে তুমিও ভাগো। শৈলজানন্দ বলেন, তোমাদের মতো মূর্খ আর পশুর সঙ্গে থাকে কে? ডাঁট দেখিয়ে চলে তো এলেন, কিন্তু বন্ধুকে এখন বলেন কী? কামরায় ঢুকতেই চোখে পড়ে নজরুল তল্পিতল্পা গুছিয়ে রেডি। যাক, মুখ ফুটে কিছু আমায় বলতে হল না, ও নিজেই টের পেয়েছে! মুখে কপট রাগ দেখান—বাহ্ ভারি স্বার্থপর তো, নিজের গুলোই শুধু গুছিয়েছ। দাঁড়াও, লোটা-কম্বল আমিও বেধেছেঁদে নিই। বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে দু' বন্ধুই মেস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন।

না, নজরুলের রাগ নেই কারুর ওপর। হয়তো আছে গভীর গোপন দুঃখ। রাগ তিনি কার ওপরে করবেন? জানেন এ মূর্খতা ও অজ্ঞানতা শুধু হিন্দুর নয়, মুসলমানেরও। তিনি মুসলমান বলে হয়তো হিন্দুর দুর্ব্যবহারে আঘাত পান, কিন্তু একইভাবে কত হিন্দুও যে মুসলমানের ব্যবহারে অপমানিত হচ্ছে, সে-কথা তিনি ভুলতে পারেন না। তাঁর দুঃখ তাই উভয় সম্প্রদায়ের জন্যে; যারা হীনচেতা, অনুদার, তাদের জন্যে। তাঁর লড়াই এই কুসংস্কার ধর্মান্ধতা ও মনুষ্যত্বহীনতার বিরুদ্ধেই। বছর কয়েক পরে একটি গান লিখেছিলেন 'জাত-জালিয়াত', পরে সেটির নাম পাল্টে তিনি 'জাতির বজ্জাতি' করেছিলেন। সে কি কম দুঃখে? দীর্ঘ কবিতা, অংশমাত্র এখানে উদ্ধৃত করছি; পড়লেই বুঝতে পারবে তাঁর হৃদয়ের দহন ও ধিক্কার :

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,
তাই ত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে এক শ'-খান!
এখন দেখিস্ ভারত-জোড়া
প'চে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া!
... ...
ভগবানের ফৌজদারী-কোর্ট নাই সেখানে জাত-বিচার,
তোর পৈতে টিকি টুপি টোপর সব সেথা ভাই এক্কাকার।
জাত সে শিকেয় তোলা র'বে,
কর্ম নিয়ে বিচার হবে,
তা'পর বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে, নরক কিম্বা স্বর্গে থোওয়া ॥

ভেবে দেখ তো, ষাট বৎসর পরেও বাঙালি সমাজ কি খুব বেশি এগিয়েছে? এখনো তো আমরা ভেদবিচার করি—ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও বৌদ্ধ, ও খ্রিস্টান। যে-নীচতা তখন

ছিল আজও তা নির্মূল হয় নি। এই লজ্জা সমগ্র বাঙালি জাতির লজ্জা। আমরা ভুলে যাই যে সর্বপ্রথম আমরা বাঙালি এবং সেটাই আমাদের মূল পরিচয়, বড়ো পরিচয়। আমরা হিন্দু না মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিষ্টান— সে-তর্ক একেবারেই অর্থহীন; কারণ ও-সব আমাদের গৌণ পরিচয় মাত্র। নজরুল এই সত্য গভীরভাবে নিজের হৃদয়ে উপলব্ধি করেছিলেন।

১১

নজরুল থাকতে লাগলেন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে একই কামরায়। শুরু হল যথার্থ সাহিত্যজীবন। এতদিন শুধু প্রস্তুতি, এবারে আসল কাজ। শুরু হল নতুন কবির বিজয়কেতন ওড়াবার পালা।

হাবিলদার কবি, তারুণ্যে দীপ্যমান, বয়স মাত্র একুশ। সরাসরি ছাউনি থেকে এসে হাজির, দূরদেশ থেকে। কতই কি-না সঙ্গে আছে—অদম্য কৌতূহল সকলের। সদ্যপরিচিত বন্ধুরা ঘিরে ধরেছে— ঝোলাঝুলিতে কী আছে দেখান দেখি! মুজফ্‌ফর আহমদ লিখছেন :

> আমি সাহিত্য সমিতির অফিসের পাশের দিককার একখানা ঘরে থাকতাম। সেই ঘরেই নজরুল ইসলামের জন্যে আর একখানা তখ্‌তপোশ পড়ল। কৌতূহলের বশে আমরা তার গাঁটরি-বোঁচকাগুলি খুলে দেখলাম। তাতে তার লেপ, তোশক ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল। সৈনিক পোশাক তো ছিলই, আর ছিল শিরওয়ানি (আচ্‌কান), ট্রাউজার্স ও কালো উঁচু টুপি যা তখনকার দিনে করাচির লোকেরা পরতেন। একটি দূরবীনও (বাইনোকুলার) ছিল। কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি, ইত্যাদিও ছিল। পুস্তকগুলির মধ্যে ছিল ইরানের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের একখানা খুব বড় সংস্করণ। তাতে মূল পার্সির প্রতি ছত্রের নীচে উর্দু তর্জমা দেওয়া ছিল।

সম্পদ কি সম্পত্তিতে? সম্পদ তো মনে, হৃদয়ের ঔদার্যে। যেখানেই নজরুল সেখানেই বাছবিচার নেই ধর্মের, বাছবিচার নেই বয়সের। প্রথম সন্ধ্যাতেই গানের আসর বসল সমিতির একটি ঘরে। রবীন্দ্রনাথের গান সর্বাধিক প্রিয় নজরুলের, কিন্তু সেদিন তিনি কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত গান নি; গেয়েছিলেন একটি ঠুমরি— পিয়া বিনা মোর জিয়া না মানে বদ্‌রী ছায়ী রে।

কলকাতায় দু' দিন থেকেই তিনি গেলেন চুরুলিয়ায়। সপ্তাহখানেক সেখানে থাকার ইচ্ছে। মা-ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজনদের একবার দেখে আসা। নিজের গ্রামে এই-ই তাঁর শেষ যাওয়া। মাতা-পুত্রের মধ্যে কিছু একটা নিয়ে মান-অভিমান হয়েছিল— নজরুল সেই যে চলে এলেন, আর কখনো মায়ের কাছে ফিরে যান নি।

কলকাতায় ফিরে আসছেন, মনমেজাজ খারাপ। মাঝপথে বর্ধমানে নেমে পড়লেন। ঘুরে বেড়াতে নয়, কাজেই নামলেন। কথাটা মাথায় এসেছিল সম্ভবত ট্রেনেই। কলকাতায় তাঁর চলবে কী করে? খাওয়াপরার জন্যে কিছু আয়-উপার্জন তো দরকার— তার ব্যবস্থা কী হবে? কলকাতা বিরাট শহর, উমেদারি করার মতো লোকজন তাঁর জানা নেই। যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁরাও তো তাঁরই মতো, কোনো চালচুলো নেই। তাঁর মনে হল, যদি কিছু হয় তো বর্ধমানেই হবে। কারণ, তিনি এই জেলারই ছেলে, সেই হিসেবেই তিনি

ফৌজে নাম লিখিয়েছিলেন; অতএব জেলা-শহরে অর্থাৎ বর্ধমানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসকে তিনি সঙ্গতভাবেই চাকরি দেওয়ার কথা বলতে পারেন। অতঃপর রেলস্টেশন থেকে সোজা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস। সেখানে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে সাব-রেজিস্ট্রারের চাকরির জন্যে দরখাস্ত করে দিলেন। চাকরি ঠিক হলে তাঁকে জানাবে কোথায়? তিনি চুরুলিয়ার ঠিকানা দিলেন না, লিখলেন কলকাতায় ঠিকানা : ৩২ কলেজ স্ট্রীট। মনে আশা নিয়েই কলকাতায় ফিরেছিলেন নজরুল। পল্টনফেরত বহু পরিচিত লোকেই তো চাকরি পাচ্ছে, তারাও তো এমন কিছু উচ্চশিক্ষিত নয়, তা হলে তাঁরই-বা চাকরি হবে না কেন? এইসব সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতেই রাজধানীতে ফিরে এলেন।

না, ভাবনায় তাঁর কোনো ভুল ছিল না। এক দিন সত্যি সত্যিই ইণ্টারভিউ লেটার এসে হাজির। তার মানে— চাকরি আছে, সে চাকরি তাঁকে দিতেও আপত্তি নেই, তবে চাকরি করার যোগ্যতা তাঁর কতখানি আছে তা একটু যাচাই করে দেখে নিতে চায়। ওদিকে সাহিত্য-সমিতির অফিস ততদিনে আড্ডায় গানে হাসিতে সরগরম জমজমাট হয়ে উঠেছে এবং তার মধ্যমণি হচ্ছেন হাবিলদার সাহেব। সময় যে কেবলি আলস্যে ও নিষ্কর্মে কেটে যাচ্ছে, তা নয়। তাঁর কলম চলছে। গল্প কবিতা গান প্রবন্ধ সবই লিখতে চেষ্টা করছেন। নতুন পত্রিকা বেরুতে যাচ্ছে একটা, স্বাভাবিকভাবেই তার প্রধান লেখক তো তিনিই হবেন! আর তিনি কিনা সরকারি চাকরির ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছেন? তিনি যে আড্ডার প্রাণ, কেন্দ্রীয় শক্তি। বন্ধুবান্ধব সকলে হৈ-হৈ করে ওঠেন— অসম্ভব, নজরুলের যাওয়া হতেই পারে না। স্বার্থ শুধু তাঁদেরই নয়, নজরুলের আছে— তাঁরা বোঝাতে লাগলেন। ইণ্টারভিউ দিতে যাওয়ারই দরকার নেই আপনার, গেলেই চাকরি হয়ে যাবে, তখন আর 'না' বলতে পারবেন না। তারপর কোথায় কোন গ্রামেগঞ্জে আপনাকে পাঠিয়ে দেবে, কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তখন সেখানেই পড়ে থাকতে হবে, কলকাতার সঙ্গেও সম্পর্ক শেষ! আপনি লেখক, আপনি কবি, আপনার আসল কাজ তো সাহিত্যরচনা, সাব-রেজিস্ট্রারগিরি করা নয়। আর, কলকাতার সাহিত্যিক পরিবেশ আপনি কোথায় পাবেন? অতএব কলকাতা ত্যাগ করার অর্থই হচ্ছে আপনার প্রতিভার অপমৃত্যু।

ব্যস্, ব্যাপারটা চুকল, সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়ে গেল। নজরুলকে এত বেশি বুঝিয়ে বলার দরকারও ছিল না। যে-ব্রিটিশকে তাড়াতে চাই, তাদেরই চাকরি করব, তাদের দয়ায় বেঁচে থাকব? যুদ্ধে গিয়েছি— সে তো চাকরি করতে নয়, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাই তখন উদ্দেশ্য ছিল। মনের ভিতরে এই যুক্তিগুলোও নিশ্চয়ই তাঁকে পথ দেখিয়েছিল। চাকরিকে সেলাম। আমার কলকাতাই ভালো।

কলকাতায় যখন নজরুল স্থায়ীভাবে থাকার মনস্থ করলেন তখনও তিনি বিখ্যাত নন। হ্যাঁ, অনেকেরই চোখ পড়েছে ঠিকই— সাহিত্যরচনা করেন অথচ পেশায় হাবিলদার, কে ইনি? কবিতা কিন্তু তখনও অতি অল্পই প্রকাশিত হয়েছে, বরং তার চেয়ে বেশি বেরিয়েছে গল্প। তবু সব মিলিয়ে সে-সবও যে সংখ্যায় অনেক, তাও নয়। আসলে, প্রকৃত নজরুলের সাক্ষাৎ এবার আমরা পাব। অর্থাৎ যে-নজরুল যুগান্তকারী প্রতিভা হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠবেন তাঁর পদধ্বনি এবারে আমরা শুনতে পাব। সারা কলকাতা অবাক হয়ে আবিষ্কার করবে— কবি বা সাহিত্যিক বা গায়ক ইত্যাদি পরিচয় তাঁর কোনো পরিচয়ই নয়, কেননা ও-রকম হয়তো আরো লোক আছেন যাঁরা লেখেন বা গাইতে পারেন; আর নজরুল? তিনি এমন ধাঁচের এক চরিত্র যেমনটি এর আগে কেউ দেখে নি।

কৈশোরের লাজুক ও দামাল ছেলেটি করাচির সেনানিবাস ঘুরে এসে এমন কী পাল্টে গেল? সত্যিই পাল্টেছিলেন কিনা কে বলবে! হয়তো তারুণ্যে যা ছিল অস্ফুট অস্পষ্ট, যৌবনে তাই বিকশিত হয়ে উঠেছিল পরিপূর্ণ প্রাণপ্রবাহে। নজরুলের অসংখ্য ছবি রচিত হয়ে ছড়িয়ে আছে তাঁর অগণ্য বন্ধুদের স্মৃতিচারণিক রচনায়। স্মৃতিচারণ যাঁরা করেছেন তাঁরা সকলেই বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বনামধন্য ব্যক্তি। তাঁদের ভিতরে আছেন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সঙ্গীতশিল্পী, রাজনীতিবিদ! কত জনের নাম করব? তোমরা বড়ো হয়ে এঁদের সকলেরই লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবে। মানুষ নজরুলকে চিনতে হলে তাঁর সম্পর্কে এঁরা যা লিখেছেন তা না-পড়ে উপায় নেই।

নজরুলের এ-সময়ে বয়স কত? একুশ-বাইশ মাত্র। তখনকারই ছবি এঁকেছেন দু'জন : এক জন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অন্য জন নলিনীকান্ত সরকার। গ্রাম থেকে ঘুরে আসার কিছু পরের ঘটনা :

> বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রিট। নজরুলই লিখেছে এই ডেরাটা আমার সুপরিচিত। মুজফ্‌ফরের কাছে শুনেছে নিশ্চয়। কিন্তু মুজফ্‌ফরের ঘরে এসে দেখি কেউ নেই। ভোঁ-ভোঁ খালি পড়ে আছে। সামনে আফজলের ঘরও তালাবন্ধ। আর মুসলিম-সাহিত্য-সমিতির আপিস এখনো খোলবার সময় হয় নি। একটু ইতস্তত করে খোলা ঘরখানার ভিতর ঢুকে পড়লাম। এ প্রান্তের দরজা থেকে লম্বা ঘরের ও-প্রান্তে এলাম চলে। হঠাৎ কানে বেজে উঠল হারমোনিয়ামের সুর, তার সঙ্গে কে যেন গলা মেলাবার চেষ্টা করছে। আওয়াজটা আসছে ভিতর থেকে, ঘরের এ-পাশের দরজা পেরিয়ে একটু অন্দরমহল আছে যেন। তবে একক মানুষের ডেরা, অন্দর থাকলেও সেখানে জানানা নেই — এই ভরসায় একটু উঁকি মারলাম। দেখি, একটি কেওড়া কাঠের নেড়া তক্তপোশে বসে একজন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে, পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। সুরের আবেগে মাথা নাড়াতে যে-ভাবে তার চুল দুলে উঠছে, তাতে আমার লেশমাত্র সংশয় রইল না— এ-ই...।
>
> ভিতরে সোজা ঢুকে যাব কিনা ভাবছি, এই সময় সে এদিকে দৃষ্টি ঘোরাতে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বললাম, হাবিলদার শাহেবকে চাই।
>
> কোলের উপর থেকে হারমোনিয়ামটা নামিয়ে উঠে দাঁড়াল নজরুল। এক লাফে উঠে এসে একবার আমায় আপাদমস্তকে দেখে নিলে, তার পরই, আপনি পবিত্র গাঙ্গুলী! — এই মন্তব্য করে সঙ্গে সঙ্গে দু-হাত দিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল আমায়। বললে, খবর পেলে একটুও দেরি করবেন না, এ আমি জানতাম।
>
> বাইরের ঘরে দুজনে এসে তক্তপোশ জাঁকিয়ে বসলাম। প্রশ্ন করলাম, আমি যে পবিত্র গাঙ্গুলী, একথা বুঝলে কি করে?
>
> বুঝতে সময় লাগে নি, হেসে উঠল নজরুল। সে যেন আসবে আমার মন বলেছে, গেয়ে উঠল গানের কলিটা। অবশ্য অঙ্ক কষেও প্রমাণ করতে পারতাম— এ পবিত্র গাঙ্গুলী না হয়ে যায় না। যদিও আমি অঙ্কে বরাবরই নিরেট।
>
> অঙ্ক কষে পবিত্র গাঙ্গুলী, মানে? ঔৎসুক্য জাগল আমার।
>
> মানে, আমাকে এই বিরাট কলকাতার শহরে চেনে মাত্র চার জন লোক, আর তাঁদের মধ্যে তিন জনকে ইতিমধ্যেই আমি চোখে দেখেছি, অতএব চতুর্থ জন আমার না-দেখা প্রিয় পবিত্র গাঙ্গুলী না হয়ে যায় না।
>
> ... ...
>
> একটু পরেই ফিরে এল নজরুল, এক হাতে চায়ের কেটলি ঝুলছে, আর এক হাতে সিঙাড়ার ঠোঙা, কলাপাতায় মোড়া একগাদা পান।

কি হে, তুমি যে ফিস্টি বসাচ্ছ দেখছি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বসাব না কেন? হেসে বললে নজরুল। বাঙালীর ছেলে, বহুদিন বাদে বন্ধুমিলন হলে খেয়েদেয়ে উৎসব করবে না তো কি? চা, সিঙাড়া, পান— মজলিস করবার তিন প্রধান রেস্ত।

... ...

এমন সময় কোঁকড়ানো বাবরি চুল, গোঁফ-ওঠা, পাঞ্জাবি গায়ে একটি ছেলে এসে ঘরে ঢুকল।

এই শৈলজা, নজরুল পরিচয় করিয়ে দিলে আমাকে। আর এই পবিত্র গাঙুলী!

... ...

আপনিও তো কবিতা লেখেন? শৈলজাকে প্রশ্ন করলাম। বলছিল নজরুল, তাও নাকি প্রেমের কবিতা।

তাই ত সবাই ধরে নিয়েছে কিচ্ছু হবে না তোর, বললে নজরুল। আমি তো নিশ্চিন্ত।

নাই-বা হল রে ভাই, কি হবে আর কি হচ্ছে না-হচ্ছে, তাই নিয়ে মাথা ঘামাই না। তার চেয়ে নুরু, একটা গান গা না।

বলতে দেরি সইল না, হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে নজরুল শুরু করে দিলে :

'দারুণ অগ্নিবাণে রে, হৃদয় তৃষায় হানে— '

ঘর কাঁপিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে গেয়ে চলল নজরুল। প্রতিটি কথা স্পষ্ট, জোর করে উচ্চারণ করছে— যেন সুরের তলায় কথা চাপা না পড়ে। কিন্তু সবশেষ যখন গাইছে : 'ভয় নাহি ভয় নাহি!' তখন সুর উঠেছে সপ্তমে, সকল ভয় যেন অপসারিত করতে চাইছে সব দিক থেকে। শুধু খর চৈত্রের অগ্নিবাণের ভয় বিদূরণ করতে কেউ অতখানি উদাত্ত হয়ে উঠতে পারে না। তার সেই সুর এবং উচ্চারণের মধ্যে সর্বযুগের সর্বভয়হারা আশ্বাসবাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে, সবাইকে ডেকে বলছে, মাভৈঃ।

এই হচ্ছে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ। কে ইনি? এক কথায় পরিচয় দেওয়া মুশকিল। বরং বলা ভালো, কী নন ইনি? সর্বখানে আছেন, সর্বজনের সঙ্গে আছেন। প্রচুর লেখাপড়া, বিদেশী সাহিত্য অনুবাদে সিদ্ধহস্ত। ডাকসাইটে পণ্ডিত ও বিখ্যাত সাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় প্রমথ চৌধুরীর পত্রিকা 'সবুজপত্র' ইনি দেখাশোনা করেন। এঁরই সম্পর্কে লিখে গেছেন বন্ধু সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নজরুলের বন্ধু, তাঁর 'কল্লোল যুগ' বইয়ে :

...বিশ্বজনের বন্ধু এই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। বুড়ো হোক, কচি হোক, বনেদী হোক, নির্বনেদ হোক, সকল সাহিত্যিকের সে স্বজন-বান্ধব। শুধু মনে মনে নয়, পরিচয়ের অন্তরঙ্গ নিবিড়তায়। শুধু উপর উপর মুখ-চেনাচেনি নয়, একেবারে হাঁড়ির ভিতরের খবর নিয়ে সে হাঁড়ির মুখের সরা হয়ে বসবে। একেবারে ভিতরের লোক, আপনার জন। বিশ্বাসে অনড়, বন্ধুতায় নির্ভেজাল। এদল-ওদল নেই, সব দলেই সমান মান। পূর্ববঙ্গে বর্ষার সময় পথ-ঘাট খেত-মাঠ উঠান-আঙিনা সব ডুবে যায়, এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে হলে নৌকো লাগে। পবিত্র হচ্ছে সেই নৌকো...

লেশমাত্র অভিমান নেই, অহঙ্কার নেই। নিষ্ঠুর দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে, তবু সব সময়ে পাবে নির্বারিত হাসি। আর, এমন মজার, ওর হাত-পা চোখ-মুখ সব আছে, কিন্তু ওর বয়েস নেই। ভগবান ওকে বয়েস দেন নি। দিন যায়, মানুষ বড় হয়, কিন্তু পবিত্র যে-পবিত্র সেই পবিত্র।

পবিত্র মূলত ছিলেন সাংবাদিক ও সাহিত্যকর্মী। দু' খণ্ডে "চলমান জীবন" নামে এঁর একটি বই আছে—গল্পের বই নয়, সবই সত্যি ঘটনা : তাঁর জীবন, তাঁর সময়, সে-যুগের মানুষজন, কী চমৎকার ভাবেই না লিখে রেখেছেন সেখানে! সম্প্রতি বইটি পুনরায় ছাপা হয়ে এক খণ্ডে বেরিয়েছে।

১২

যা বলছিলুম। ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে আসর গুলজার। নজরুল এসেছেন মার্চ মাসে। আর আগামী মাস এপ্রিল থেকে একটি পত্রিকা বেরুবে এ-বাড়ি থেকে। মাসিক পত্রিকা। কী নাম হবে, কবে বেরুবে ইত্যাদি আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল। নাম হবে 'মোসলেম ভারত', সম্পাদক মোজাম্মেল হক, আর বেরুবে এপ্রিল মাস থেকে। পত্রিকার মূল কাণ্ডারী কিন্তু আফজালুল হক। তিনি থাকেন সমিতি অফিসেরই একটি ঘরে, একেবারে পাশের ঘর। পত্রিকায় নাম যাবে বটে কবি মোজাম্মেল হকের, তবে পত্রিকার যাবতীয় কাজকর্ম-দায়দায়িত্ব সব কিছুরই ভার ন্যস্ত হয়েছে তাঁর পুত্র আফজালুল হকের উপরে। হক সাহেব ছিলেন উদারপন্থী, এবং পত্রিকার নামে 'মোসলেম' কথাটি থাকলেও কোনোরকম ধর্মীয় গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন থাকবে না কোনো লেখায়। প্রথম সংখ্যা বেরুবে, প্রেসে ছাপার কাজ শুরু হয়ে গেছে। নজরুলকে তিনি বললেন— প্রত্যেক সংখ্যায় আপনি লেখা দিন। নজরুল সঙ্গে সঙ্গে রাজি। এতে লাভ হল দু'জনেরই। এক জন লেখকও যদি নির্দিষ্ট ও পাকাপোক্তভাবে পাওয়া যায় তা হলে পত্রিকা চালানোর পরিশ্রম কিছুটা বাঁচে, লেখা খোঁজার ঝক্কি কম পোয়াতে হয়। অন্য দিকে নজরুলেরও কোনো ভাবনা রইল না— তিনি যা-ই লিখবেন তা-ই প্রকাশের একটা ক্ষেত্র মজুত রইল।

নজরুলের হাতে সেই মুহূর্তে তৈরি ছিল একটি পত্রোপন্যাস, অর্থাৎ চিঠির আকারে রচিত একটি উপন্যাস। করাচিতে থাকতেই লেখা শুরু করেছিলেন, তখনও শেষ হয় নি। ঠিক হল— এটি 'বাঁধন-হারা' নামে ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় ছাপা হবে মাসে মাসে। এর পূর্বে যে-সব কাগজে তিনি লিখেছেন, যেমন 'সওগাত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'প্রবাসী', বা 'নূর' পত্রিকায়, প্রায় সবখানেই তিনি লিখেছেন গল্প। যে-প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় কবি ও গীতিকার রূপে, তিনি এখনও আবির্ভূত হন নি। সেই আবির্ভাবই ঘটল 'মোসলেম ভারত' মাসিক পত্রিকাকে উপলক্ষ করে এবং 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কামাল পাশা', 'বিদ্রোহী' প্রভৃতি একটির পর একটি আলোড়নকারী কবিতায়। 'শাত-ইল-আরব' থেকেই রসিকজন ও সাহিত্যিক সমাজের দৃষ্টি পড়েছিল তাঁর ওপর।

কী কাণ্ড! এ যে একেবারেই অন্য স্বাদের ভিন্ন ধাঁচের কবিতা! বাংলা কবিতায় অবলীলাক্রমে এসে যাচ্ছে আরবি-ফার্সি শব্দ, আসছে মধ্যপ্রাচ্য বা আরব-পারস্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতির কত নাম, কত কাহিনী! আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার অবশ্য ঠিক নতুন নয়; বয়োজ্যেষ্ঠ বিখ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা তাঁর কনিষ্ঠ ও বয়সে তরুণ

অধ্যাপক-কবি মোহিতলাল মজুমদার ইতঃপূর্বেই তা চালু করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, এ-ঘটনাটিও সর্বপ্রথম যে এ সময়েই ঘটল, তাও নয়; অনেক পূর্বে 'রায়গুণাকর' কবি ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় কিংবা গ্রামে-গঞ্জে হাট-বাজারে সন্ধ্যায় পিদিমের আলোতে যে-পুঁথি পড়া হয় সুর করে, সেখানেও আরবি-ফার্সি মেশানো বাংলা কবিতার কথা তো সবাই জানেন। তাই অবাক হওয়ার কারণ ওখানে নয়। আসল রহস্য অন্যখানে। নজরুল আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে কবিতায় এক ধরনের বীরত্বের আবেগ, জঙ্গী মনোভাব, চিৎকার ও আন্দোলনের কণ্ঠস্বর নিয়ে এলেন এবং এই ঘটনাটিই সর্বতোভাবে নতুন।

শাত-ইল-আরব একটি সুপ্রাচীন নদীর নাম; সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সঙ্গে এ-নদীর যোগ আছে, আবার ইসলামি সভ্যতা ও কারবালার যুদ্ধেরও তা সাক্ষী। উপরন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে শাত-ইল-আরবের মোহনায় তুরস্ক ও ইংরেজদের মধ্যে জোর যুদ্ধ চলে, সে-লড়াইয়ে ইংরেজদের সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সেনাও ছিল। এবারে শোনা যাক কবিতাটির কিছু পঙ্‌ক্তি :

'জুলফিকার' আর 'হায়দরী' হাঁক হেথা আজো হজরত আলীর—
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।
ললাটে তোমার ভাস্বর টীকা
বস্‌রা-গুলের বহ্নিতে লিখা;
এ যে বসোরার খুন-খারাবি গো রক্ত-গোলাপ-মঞ্জরীর!
খঞ্জরীর
খঞ্জরে ঝরে খর্জুর-সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত-শির!
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
ইরাক্-বাহিনী! এ যে গো কাহিনী,—
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে "জননী আমার!" বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর!
রক্ত-ক্ষীর—
পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু' ফোঁটা ভক্ত-বীর।
শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির!

কবির দুঃখ কেন! কেন তিনি অভাগা? আমরা বুঝতে পারি — কারণ, তিনি যে নিজের দেশেও পরাধীন।

'কামাল পাশা' কবিতাও একই গোত্রের কবিতা :

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর-সে সামাল সামাল তাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল ! তু নে কামাল কামাল কিয়া ভাই !
লেফ্‌ট! রাইট! লেফ্‌ট!!
লেফ্‌ট! রাইট! লেফ্‌ট!!
... ...
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া!
বুজ্‌দিল্ ঐ দুশমন্ বিল্‌কুল্ সাফ্ হো গিয়া!

খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া,
হুর্‌রো হো!
হুর্‌রো হো!
দস্যুগুলোয় সাম্‌লাতে যে এমনি দামাল কামাল চাই,
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

কিন্তু কেবলই কি এই? সবই কি এক ধরনের কবিতা? কে বলে! 'কামাল পাশা' বেরুবার আগের মাসেই যে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের পত্রিকা 'উপাসনা'য় একটি কবিতা বেরুল! সে-খবরও তো রাখা চাই। কবিতার নাম 'আগমনী'; আরবি-ফার্সি-ইসলামি ঐতিহ্য পড়ে রইল দূরে, একেবারে নিপাট হিন্দু ঐতিহ্য ও দেব-দেবীর সরাসরি আমদানি, তারই সঙ্গে পরাধীন দেশমাতৃকার জন্যে দুঃখজ্বালা।

আজ রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ্ মহারণ,
দশদিকে তাঁর দশ হাতে বাজে দশ প্রহরণ!
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে—
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর!
'নাই দানব
নাই অসুর—
চাই নে সুর,
চাই মানব!'—
বরাভয় বাণী ঐরে কা'র
শুনি, নহে হৈ রৈ এবার!
... .
আজ কাঁপুক মানব-কলকল্লোলে কিশলয় সম নিখিল ব্যোম!
স্বা-গতম্
স্বা-গতম!!
মা-তরম্!
মা-তরম্
ঐ ঐ ঐ বিশ্বকণ্ঠে
বন্দনা-বাণী লুণ্ঠে— "বন্দে মাতরম্!!"

এই হচ্ছেন নজরুল : হাবিলদার কবি, মুসলমান কবি, হিন্দু কবি, বাঙালি কবি। অর্থাৎ তাঁর ধর্ম— তারুণ্যের উজ্জ্বল উচ্ছল দুঃসাহস ও শক্তি, তাঁর ধর্ম— বাঙালিত্ব। তিনি হিন্দু নন, তিনি মুসলমান নন, তিনি নির্ভেজাল বাঙালি কবি। স্বার্থান্ধ ও ক্ষুদ্রচেতা হিন্দু যারা বলে— ও মুসলিম, আমাদের কেউ নয়, কিংবা ধর্মান্ধ যে মুসলমান বলে— ও মুসলমান, আমারই জাতভাই, ও কাফের নয়, তাদের দু' জনকেই নজরুল এভাবে বুঝিয়ে দিলেন : আমি তোমাদের কেউ নই, আমি মানুষ এবং আমি বাঙালি এবং আমি কবি।

এই কথাটাই একটি কবিতায় সবচেয়ে চিৎকার করে সমগ্র বাংলাকে তিনি শুনিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন। এক দল অরসিক ও ধর্মান্ধ মুসলমান চেঁচিয়ে উঠল— ও কাফের,

আমাদের শত্রু। চেঁচিয়ে উঠল হিন্দুরাও— আমাদের ধর্ম নিয়ে অশ্রদ্ধা! এত বড়ো স্পর্ধা! শুধু যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা গুণী, যাঁরা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বোঝেন, তাঁরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠলেন— বাহ্, কী চমৎকার সাহস! এতদিন পরে এক নতুন শক্তিশালী কবি বাংলা মায়ের কোল আলো করে উদয় হল, কী সৌভাগ্য আমাদের!

ঐ কবিতার নাম 'বিদ্রোহী':

বল বীর—
বল! উন্নত মম শির।
শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর—
আমি চির উন্নত শির।

এই হল 'বিদ্রোহী' কবিতার শুরু; এক শ' একচল্লিশ পঙ্‌ক্তির সুদীর্ঘ বর্জনির্ঘোষ ও মানুষের আত্মপরিচয় দান পৃথিবীর বুকে।

'বিদ্রোহী' কবিতার প্রথম শ্রোতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ। সাহিত্য-সমিতির বাড়ি ছেড়ে দিয়ে উভয়েই তখন অন্যত্র থাকছেন। মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন :

> আমাদের ৩/৪-সি, তালতলা লেনের বাড়ীটি ছিল চারখানা ঘরের একটি পুরো দোতলা বাড়ী। তার দোতলায় দু'খানা ঘর ... ছিল। ... নজরুল আর আমি নীচের তলায় পূর্ব দিকের, অর্থাৎ বাড়ীর নীচেকার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরটি নিয়ে থাকি। এই ঘরেই কাজী নজরুল ইসলাম তার "বিদ্রোহী" কবিতাটি লিখেছিল। সে কবিতাটি লিখেছিল রাত্রিতে। রাত্রির কোন্ সময়ে তা আমি জানি নে। রাত দশটার পরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধু'য়ে এসে আমি বসেছি এমন সময়ে নজরুল বলল, সে একটি কবিতা লিখেছে। পুরো কবিতাটি সে তখন আমায় পড়ে শোনাল। "বিদ্রোহী" কবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা। ... নজরুলের কিংবা আমার ফাউণ্টেন পেন্ ছিল না। দোয়াতে বারে বারে কলম ডোবাতে গিয়ে তার মাথার সঙ্গে তার হাত তাল রাখতে পারবে না, এই ভেবেই সম্ভবত সে কবিতাটি প্রথমে পেন্সিলে লিখেছিল।

কবি আনন্দে আবেগে উত্তেজিত, কী সুন্দর একটা কবিতা লেখা গেল। একটু বেলা হতেই 'মোসলেম ভারত'-এর আফজালুল হক এসেছেন, তাঁকেই দেওয়া হল কবিতা— সামনের কার্তিক সংখ্যায় ছাপবেন। কিন্তু এই কার্তিক সংখ্যা বেরিয়েছিল তিন-চার মাস পরে। তার আগে ছাপা হয়ে গেল অন্য কাগজে। 'বিজলী' সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, চালাতেন সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবে বিশ্বাসী রাজনীতি-সচেতন এক দল তরুণ। এই 'বিজলী' পত্রিকার অফিসেই নজরুলকে প্রথম দেখেছিলেন নলিনীকান্ত সরকার, বৎসরখানেক আগে :

তের শ সাতাশ সালের অগ্রহায়ণ মাস। সান্ধ্য ভ্রমণ সেরে আমাদের সেকালের 'বিজলী' আপিসের বাড়িতে ফিরে দেখি, জন কয়েক তরুণকে নিয়ে চিরতরুণ বারীন-দা (শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ) বেশ আড্ডা জমিয়েছেন। ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন, 'নজরুল ইসলামের কবিতা পড়েছো?' উত্তর দিলাম 'হাবিলদারের মতোই কবিতা'। সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম অট্টহাসির উত্তাল তরঙ্গ বেরিয়ে এলো একটি তরুণের মুখের ভেতর থেকে। বারীন-দা সেই তরুণটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'ইনিই হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম।' নজরুল ইসলাম মানুষটিকে সেদিন খুবই ভালো লাগলো। প্রাণখোলা হাসি, মনখোলা কথা, দিল্-খোলা মানুষ। রোমন্থন ক'রে চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা ব'লে কৃত্রিম সভ্যতা জাহির করবার প্রয়াসের বালাই নেই ... ।

যাই হোক, আফজালুল হক চলে যাওয়ার পরপরই 'বিজলী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবী কর্মী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এসেছিলেন আড্ডা দিতে। নজরুল তাঁকেও শোনালেন রাত্রে রচিত প্রেরণাতাড়িত ঐ কবিতা। উচ্ছ্বসিত ভট্টাচার্য মহাশয় প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন সেটা 'বিজলী'তে ছাপাবেন বলে। এভাবে 'বিদ্রোহী' কবিতা 'বিজলী'তে প্রথম বেরুল, ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষ সংখ্যায়। রীতিমতো হৈ-চৈ পড়ে গেল।

হু হু করে কাটতি বেড়ে গেল কাগজের, সব কপি শেষ — একই সপ্তাহে আরেক বার ছেপে বের করতে হল 'বিজলী', কেবল ঐ কবিতাটির জন্যেই। 'প্রবাসী' তখন সবচেয়ে অভিজাত ও খ্যাতনামা মাসিকপত্র। সেখানে পুনরায় মুদ্রিত হল 'বিদ্রোহী', তাও জনপ্রিয়তার কারণেই। তারপর 'মোসলেম ভারত'-এও প্রকাশিত হল, যদিও দেরি করে। সংক্ষেপে, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন নজরুল। এত বিখ্যাত যে, তাঁকে বলা হতে লাগল 'বিদ্রোহী কবি'। ভক্ত পাঠকের দেওয়া এই শিরোপা আজও তাঁর মাথায় জ্বলজ্বল করছে।

এই যেন শুরু। বাঁধভাঙা বন্যার মতো কবিতা ও গানের ঢল নামল এর পর থেকে।

১৩

কাজী নজরুল ইসলামের কলকাতায় আগমন ও 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে দেশবিখ্যাত হওয়ার মাঝখানে দু' বৎসরের ব্যবধান। কেবলই সাহিত্যরচনা নয়, শুধুই সাহিত্যিক আড্ডা নয়, এই বৎসর নজরুল নিজেকে জড়িয়েছিলেন আরো অনেক কাজে। বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সী উদ্দাম বাঙালি কবির সেই কর্মচাঞ্চল্য না জানলে তাঁর অনেক কিছুই জানা হবে না। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম কবি যিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক কর্মী ও সাংবাদিক অপেক্ষা সৃষ্টিশীল কবি-সাহিত্যিক রূপে তিনি অনেক বড়ো, তবুও তাঁর রাজনীতি ও সাংবাদিকতা না বুঝতে পারলে কবি নজরুলের সম্পূর্ণ পরিচয় আমাদের অজানা থেকে যাবে।

নজরুলকে তৈরি করেছিল যুগের হাওয়া। বিপ্লবী বাংলা মায়ের যে দামাল ছেলে যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিল সে-ই ফিরে এসেছিল 'বিদ্রোহী' হয়ে। কমরেড মুজফ্ফর আহমদ নিজে

ছিলেন কমিউনিস্ট, রাজনীতিতে মন-প্রাণ সঁপে দেওয়া মানুষ। তিনি নজরুলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কোনো রাজনীতিতে যোগদানের ইচ্ছা নজরুলের আছে কিনা। কবি স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন যে— অবশ্যই আছে, নইলে যুদ্ধে তিনি গিয়েছিলেন কেন? তখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই দু' বন্ধু একটি পত্রিকা বের করার চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। দৈনিক পত্রিকা হওয়া চাই এবং তা বাংলা ভাষায়। প্রকাশিত হবে সন্ধেবেলায়, কেননা সে-আমলে বাংলা খবরের কাগজ সন্ধেয় বের হত, সকাল বেলায় বেরুত কেবল ইংরেজি দৈনিকগুলো। কিন্তু কাগজ বের করার জন্যে তো টাকা চাই, তার উপায় কী হবে?

অনেক জল্পনা-কল্পনার পর তাঁরা হাইকোর্টের এডভোকেট ও উদীয়মান রাজনীতিক এ. কে. ফজলুল হকের সঙ্গে আলোচনা করার মনস্থ করলেন। ফজলুল হকের নাম নিশ্চয়ই তোমাদের অজানা নয়। 'শেরে বাংলা' ফজলুল হক। বাংলার রাজনীতিতে সারা জীবন সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, ভারত-ভাগের পূর্বেও, আবার ১৯৪৭-এর পরেও। লম্বা-চওড়া বিশালদেহী পুরুষ, অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন তিনটি ভাষায়— বাংলা, ইংরেজি ও উর্দুতে, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনত। জনদরদী নেতা ছিলেন, কৃষকদের বন্ধু। যে-সময়ের কথা হচ্ছে তখন অবশ্য তিনি অত বিখ্যাত হন নি, 'শেরে বাংলা' নয়, শুধুই ফজলুল হক। যাই হোক, আলাপ-আলোচনা সফল হল। কাগজের নাম ঠিক হল 'নবযুগ'। সম্পাদনার দায়িত্ব নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহমদের উপর, আর পরিচালক হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হবে। পত্রিকার সাইজ ২০ × ২৬ ইঞ্চি; দাম রাখা হল এক পয়সা।

'নবযুগ' বেরুল ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই। ইতঃপূর্বে নজরুল কোনো পত্রিকায় কাজ করেন নি, সাংবাদিকতার কোনো অভিজ্ঞতাই তাঁর ছিল না; তা সত্ত্বেও সহজাত তীক্ষ্ণ মেধা, কাব্যরুচি এবং প্রখর কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগের ফলে সাংবাদিকতা-কর্মে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচারিত হয়ে উঠতে যে-কোনো সংবাদপত্রেরই ন্যূনতম কিছু সময় লাগে, অথচ 'নবযুগ' প্রথম সংখ্যা থেকেই পাঠকের মন জয় করে নিল। সহকর্মী বন্ধু কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ এমন অভাবিত সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে :

> ... নিশ্চয়ই নজরুলের জোরালো লেখার গুণে প্রথম দিনেই কাগজ জনপ্রিয়তা লাভ করল। হিন্দু-মুসলমান দু'জনাই কাগজ কিনলেন।... দৈনিক কাগজে লেখার অভিজ্ঞতা আমাদের ভিতরে একজনেরও ছিল না। নজরুল ইসলাম কোনো দিন কোনো দৈনিক কাগজের অফিসেও ঢোকে নি। তবু সে বড় বড় সংবাদগুলি পড়ে সেগুলিকে খুব সংক্ষিপ্ত করে নিজের ভাষায় লিখে ফেলতে লাগল। তা না হলে কাগজে সংবাদের স্থান হয় না। নজরুলকে বড় বড় সংবাদের সংক্ষেপণ করতে দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ঝানু সাংবাদিকরা ও এ কৌশল আয়ত্ত করতে হিমশিম খেয়ে যান। তার পরে নজরুলের দেওয়া হেডিং-এর জন্যেও "নবযুগ" জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা তার পড়া ছিল। সেইসব কবিতার কিছু কিছু কথা উল্লেখ করেও সে হেডিং দিত। সে রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়ে নি। যেমন ইরাকের রাজা ফয়সলের কি একটা সংবাদকে উপলক্ষ করে সে হেডিং দিয়েছিল :
>
> আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
> পরাণ সখা ফয়সুল হে আমার।

মূলত নজরুলের লেখার জন্যই 'নবযুগ' ব্রিটিশ সরকারের রাজরোষে পড়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে বার তিনেক সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, ও-রকম লেখা ছাপলে বিপদ হবে। কিন্তু কে কাকে ভয় দেখায়! মুজফ্‌ফর-নজরুল কি ভয় পাওয়ার পাত্র? তাঁরা তো ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন নি, তাঁদের লক্ষ্য রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করা। অগত্যা, যা ঘটবার তাই ঘটল। নজরুলের এক জ্বালাময়ী প্রবন্ধ ছাপানোর অপরাধে পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করা হল। সরকারের অনুমতি ছাড়া পত্রিকা বের করা যায় না, এবং সে-অনুমতি লাভের জন্য এক হাজার টাকা সরকারি তহবিলে গচ্ছিত রাখতে হয়েছিল; সরকারবিরোধী রচনা প্রকাশের শাস্তিস্বরূপ গচ্ছিত ঐ টাকা জরিমানা হিসেবে সরকার কেড়ে নিল। টাকা হারানোর চেয়ে তখন বড়ো সমস্যা দেখা দিল পত্রিকা নিয়েই; ফের টাকা গচ্ছিত না রাখলে কাগজ পুনরায় বের করা যাবে না। ফজলুল হক সাহেবই টাকা জোগাড় করে দিলেন। প্রথম বারে লেগেছিল এক হাজার, এবারে লাগল দু' হাজার টাকা। 'নবযুগ' পুনর্বার প্রকাশিত হল। তবে বেশি দিন তাঁরা এ-কাগজ চালান নি। প্রায় বৎসরখানেক পর ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁদের সঙ্গে পত্রিকার সম্পর্ক ছিন্ন হল। নজরুল চলে গিয়েছিলেন এর মাসখানেক আগেই; তাঁকে অনেকে বোঝাচ্ছিলেন যে পত্রিকার কাজ করতে গিয়ে তাঁর নিজের রচনার ব্যাঘাত হচ্ছে। মুজফ্‌ফর সাহেব ছাড়লেন এক মাস পরে, ভিন্ন কারণে : এমনিতেই হীনস্বাস্থ্য মানুষ, একা অত পরিশ্রম সহ্য হচ্ছিল না; উপরন্তু হক সাহেব স্বাধীনভাবে আর লিখতে দেবেন না এমন আভাস তিনি পেয়েছিলেন। সম্পাদকদের দু' জনেই চলে গেলে কাগজ কিছুদিনের জন্যে বন্ধ রইল। পরে অন্য একজনকে সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে 'নবযুগ' বের করা হল বটে, তবে পাঠকসমাজ তাকে গ্রহণ করল না। নজরুলকে তখন ফের ডেকে আনা হয়, তিনি আর্থিক কারণে বাধ্য হয়ে পুনরায় কাজে যোগ দেন। সম্ভবত অস্বস্তিকর পরিবেশে তিনি আর পূর্বের ন্যায় মনপ্রাণ ঢেলে লিখতে পারছিলেন না, এবং কাগজের প্রচারও বাড়ে নি। কিছুকাল পরে তিনিও বরাবরের মতো 'নবযুগের' সংস্রব ত্যাগ করলেন। আরো কিছুদিন চলার পর একসময় কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। যাই হোক, তাঁর যুগ্ম-সম্পাদনায় যখন 'নবযুগ' বেরুত তখনকার রচনাগুলো সংকলিত করে তিনি 'যুগবাণী' নামে একটি প্রবন্ধপুস্তক প্রকাশ করলেন। ১৯২২ সালের ২৬শে অক্টোবর বইটি বাজারে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার কর্তৃক তা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল; ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে আর তা পুনঃপ্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

সাংবাদিকতাকে নজরুল তাঁর নৈতিক দায়িত্ব ও জাতীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করতেন। তিনি বুঝতেন যে এতে তাঁর সাহিত্যরচনার ব্যাঘাত হয়, সময়ের অভাব ঘটে; তা সত্ত্বেও তিনি সাংবাদিকতা ছাড়তে পারেন নি। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে তিনি 'নবযুগ' ছাড়লেও এর বছর দেড়েক পরেই আবার আরেকটি কাগজে ভিড়লেন। এটিও দৈনিক সংবাদপত্র, নাম 'সেবক'। মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এই পত্রিকা ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে বের করেছিলেন। ইনিও খুব বিখ্যাত ব্যক্তি ও পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। এঁর প্রতিষ্ঠিত 'মাসিক মোহাম্মদী' এবং 'দৈনিক আজাদ' সুদীর্ঘকাল যাবৎ নামকরা পত্রিকা ছিল। কিন্তু খাঁ সাহেব ছিলেন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন গোঁড়া মুসলমান এবং প্রগতিবিরোধী রক্ষণশীল চিন্তাধারার প্রবক্তা। নজরুলকে তাঁরা ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকরি দিয়েছিলেন, তবু তিনি এক মাসের বেশি 'সেবক'-এ কাজ করতে পারেন নি;

কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে চাকরি ত্যাগ করেন।

সাংবাদিকতার সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক তা বলে' ঘুচল না। তিনি পরে আরো দু'টি পত্রিকার সহিত যুক্ত হয়েছিলেন; বরং বলা ভালো, তিনিই ছিলেন পরিচালক-সম্পাদক-লেখক। এই দুই পত্রিকা— 'ধূমকেতু' ও 'লাঙল' সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা করব।

পত্রিকা বের করা হচ্ছে, লেখাপত্তর চলছে— সবই বোঝা গেল, কিন্তু কবির প্রাণশক্তি কি এতেই নিঃশেষিত হচ্ছিল? মোটেই না। দায়িত্ব ও কর্তব্যকর্মের চাপে তাঁর চরিত্রের কিন্তু কোনো বদল ঘটে নি। এখনও যে-কোনো মজলিসের তিনিই প্রাণকেন্দ্র। সঙ্গীতের নেশা এখন থেকেই ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। পরিচিত বন্ধুজনের আড্ডায় নজরুল সর্বদা একাই এক শ'। কেবল একটি হার্মোনিয়াম চাই, তা হলেই বিধিদত্ত ক্ষমতায় আসরের নিয়ন্ত্রণভার তাঁর হাতেই চলে আসবে। বৈঠকী গল্প, তৎসঙ্গে অফুরন্ত চা পান, মাঝেমধ্যে পান-জর্দা, ছাদ-কাঁপানো দুর্বার অট্টহাসি এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত। নজরুল বহুদিন পর্যন্ত কদাচিৎ নিজের গান গাইতেন; সে-আমলে নজরুলের গান মানেই তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান। সে-গান শোনার অভিজ্ঞতা এক বার যাঁর হয়েছে তিনি আর কখনও ভুলতে পারেন নি। তিনি নিজেই পরিহাস করে বলতেন, 'আমি সুর নই, অসুর'। তারপর হার্মোনিয়াম টেনে নিয়ে সুরের যে-পরিমণ্ডল রচনা করতেন তা অবিস্মরণীয়। কণ্ঠস্বরের শ্রবণমাধুর্য বা মিষ্টতা নয়, তাঁর কণ্ঠে ছিল এক ধরনের উন্মাদনা ও আবেগ যার স্পর্শ লেগে যে-কোনো গান অপরূপ ও অনির্বচনীয় হয়ে উঠত। তাঁর গান গাওয়ার খ্যাতি এভাবেই লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, শুধু গান শোনানোর জন্যেই নিমন্ত্রণ আসত ছাত্রমহল থেকে, বিভিন্ন পরিবার বা বিভিন্ন আসর থেকে। বেশির ভাগ সময়েই গাইতেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, কখনও-কখনও হিন্দুস্থানি গান। স্বরচিত গানে সুর দেওয়া এ-সময় থেকেই শুরু করেছিলেন।

বঙ্গদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যিনি প্রতিভার চিরস্থায়ী স্বাক্ষর রাখবেন, তাঁর সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব এভাবেই তখন তৈরি হচ্ছে।

১৪

'নবযুগ' তো ছেড়ে দিলেন ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে; বাসনা ছিল, এবার থেকে সময় কাটবে শুধুই সাহিত্য সৃজন করে : কবিতা গান গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস। অর্থাৎ লেখার জন্যে চাই অবসর, চিন্তাভাবনা করার জন্যে প্রয়োজন নিভৃতি, এবং নিভৃতির জন্যে কাম্য স্বস্তিকর ও মনের মতো একটি বাসস্থান। সাহিত্য-সমিতির কোলাহলমুখর ভবন ছেড়ে দিয়ে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে চলে এলেন ৮/এ, টার্নার স্ট্রীটে। মুসলমান বস্তি এলাকার ভিতরে ছোটো একতলা একটি পাকা বাড়ি। 'নবযুগ'-এর অফিস একেবারে পাশে, মাত্র দু'-এক মিনিটের পথ! 'নবযুগ'-এর দায়িত্বভার নামিয়ে ফেলে নজরুল দেওঘর চলে গেলেন। বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলায় স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে তখন খুব বিখ্যাত ছিল। দেওঘরে যাওয়া কিন্তু স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে নয়; তাঁকে পাঠিয়েছিলেন আফজালুল হক। এই

প্রতিশ্রুতি তিনি নজরুলের নিকট হতে আদায় করে নিয়েছিলেন যে দেওঘরে নিরিবিলিতে বসে তিনি সাহিত্যচর্চা করবেন এবং সে-সব লেখা একমাত্র 'মোসলেম ভারত'-এ ছাপার জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবেন কলকাতায়। আর এর বিনিময়ে তিনি কবিকে মাসে মাসে এক শ' করে টাকা পাঠাবেন। সোজা কথায়— লেখার চাকরি। কিন্তু ফরমাস দিয়ে তো কবিতা-গল্প ইত্যাদি লেখানো সম্ভব নয়। খুবই স্বাভাবিক যে, নজরুল চার-পাঁচটির বেশি গান এই দু' মাসের মধ্যে লিখতে পারেন নি, অন্য দিকে কলকাতা থেকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকা না আসায় তিনি আর্থিক অসুবিধেয় পড়েছিলেন। এ-রকম অবস্থার ভিতরে হঠাৎ মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর কাছে গিয়ে হাজির; কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য ছিল না, নেহাতই মনের টানে বন্ধুর কাছে বেড়াতে যাওয়া দু-চার দিনের জন্যে। গিয়েই তো বুঝতে পারলেন কবির অবস্থা। কবিকে আর দেওঘরে থাকতে না দিয়ে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। অন্য কোথাও থাকার প্রশ্ন ওঠে না— টার্নার স্ট্রিটের বাসা ছেড়ে দিয়ে মুজফ্‌ফর সাহেব তখন ১৪/২ চেতলাহাট রোডে থাকছেন, সেখানেই গেলেন দু' বন্ধু। এর আগেও দু'জনে কখনও একই ঘরে, কখনও-বা একই বাসায় থেকেছেন, তাই এখানেও একসঙ্গে থাকা সঙ্গত ও স্বাভাবিক। অথচ পরের দিন প্রায় ছোঁ মেরে তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন আফজালুল হক, তুললেন পূর্বপরিচিত সেই সাহিত্য-সমিতির বাড়িতে । এখান থেকেই কবি হুট করে চলে যাবেন কুমিল্লা, আবার কলকাতায়— তবে শহরে কেবল নয়, জেলখানায়; জেল থেকে মুক্তি, তো তারপর ছুটে বেড়ানো কৃষ্ণনগরে, হুগলিতে, ঢাকায়, ফরিদপুরে, উত্তরবঙ্গে— কোথায় নয়?

নজরুলের নিরিবিলি জীবন কি তা হলে এরই নাম— এই বিরামহীন ছুটে বেড়ানো ? আসলে তাঁর স্বভাবে কোনো আলস্য ছিল না, কোনো অনড়ত্ব ছিল না। তাঁর চরিত্রে ছিল উদ্দামতা, বন্য আবেগ, শিশুর সারল্য, আর বয়স্কের জন্য যা অমার্জনীয় সেই বেহিসেবিপনা। এ-রকম মানুষের তো 'নিরিবিলি' থাকে না, অন্তত আমরা— সাধারণ প্রতিভাহীন গতানুগতিক সামাজিক মানুষজন— নিরিবিলি বলতে যা বুঝি তেমন চুপচাপ ও শান্ত জীবন। দেওঘরে তো কবি একাকীই ছিলেন, সহচর ছিল নৈঃসঙ্গ্য ও নিস্তব্ধতা। কিন্তু কই, সেখানে তো তিনি কোনো কাজ করতে পারেন নি। বস্তুতপক্ষে নজরুল ছিলেন সেই জাতের মানুষ যাঁরা একসঙ্গে দশটা কাজের চাপ না থাকলে কোনো কাজই করে উঠতে পারেন না।

নজরুল-জীবনে তিনটি বৎসর প্রচণ্ড উথালপাথাল করা সময় : ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল। বহু কিছু ঘটবে এ সময়ে। শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেই নয়। দেশের ভিতরেই অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছিল এবং ঘটে যাবে।

দেশের তৎকালীন অবস্থা তখন কী রকম ? এক কথায় অত্যন্ত অস্বস্তিকর, অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক অবস্থা দেশের সর্বত্র বিরাজ করছে। অনেক ক'টি রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে দেশের মধ্যে। সন্ত্রাসবাদ তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খিলাফত আন্দোলন। দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির মধ্যে দেখা দিয়েছে দুটো দল— এক দল নরমপন্থী, অন্য দল চরমপন্থী। মুসলিম লীগ নামে আরেকটি রাজনৈতিক দল ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষের বাইরে একদল ভারতীয় বিপ্লবী একত্রিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখছেন। দেশের ভিতরে জনগণের ওপর ব্রিটিশের অত্যাচার চরমে উঠেছে। মহাত্মা

গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন দানা বাঁধছে। ওদিকে পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন যুগের পত্তন করেছে রাশিয়া, কৃষক-শ্রমিক-মজদুরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে উৎখাত করা হয়েছে সম্রাট ও সাম্রাজ্যবাদকে; তার ঢেউ এসে লাগছে ভারতের বুকে। এইসব ঘটনা আমাদের দেশের ইতিহাসে অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। এখন অল্প বয়সে তোমরা সব বুঝে উঠতে পারবে না, তবে আরেকটু বড়ো হলে নিজের দেশকে জানার জন্যে এই আন্দোলনগুলোর ইতিহাস তোমাদের একদিন পড়তেই হবে। আমি শুধু তৎকালীন দেশব্যাপী কর্মযজ্ঞের একটুমাত্র আভাস দিলুম। কবি নজরুলকে চিনতে হলে সেই যুগটাকে না চিনলে যে একেবারেই চলবে না, কারণ তিনি সর্বাংশে তাঁর যুগেরই সন্তান ছিলেন।

দেওঘর থেকে ফিরে কিছুদিন ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে বসবাস, তারপরে হঠাৎ এক দিন উধাও। আলি আকবর খান নামে এক পাঠ্যপুস্তক ব্যবসায়ী নিজের স্বার্থে তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। তিনি নজরুলকে নিয়ে চলে গেলেন তাঁর গ্রামের বাড়িতে, কুমিল্লায়। সেকালে কুমিল্লা জেলার নাম ছিল ত্রিপুরা। ঐ জেলারই দৌলতপুর গ্রাম; কুমিল্লা শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয়, কুমিল্লা হয়েই যেতে হয়। নজরুল জানেন যে তিনি বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছেন। আর বন্ধুর মতলব— কবিকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে নিজের ভাগ্নীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সেই অধিকারে কায়দা করে আটকে রাখা। উদ্দেশ্য —নজরুলকে দিয়ে শিশুপাঠ্য বই লেখাবেন এবং তা ছেপে নিজে বড়লোক হবেন। কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরলতায় দ্বিতীয় বার চক্রান্তের শিকারে পরিণত হলো; প্রথম বার বিপদে পড়েছিলেন দেওঘরে গিয়ে, সে তো আমরা জানি। পূর্ববঙ্গে আসা হল দ্বিতীয় বার : কৈশোরে সেই এক বার ময়মনসিংহে আর এখন এই যৌবনপ্রারম্ভে কুমিল্লায়। কুমিল্লা তাঁর জীবনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এর পরে একাধিক বার তাঁকে এখানে আসতে হবে, এদেশের মেয়েকেই তিনি জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবেন। অবশ্য সেগুলো কিছু পরের ঘটনা। এবারের আগমন তো বস্তুত চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে। বিয়ের সব ঠিকঠাক। কনের নাম সৈয়দা খাতুন; দেখতে সুন্দরী, গায়ের রং টকটকে ফর্সা, মুসলিম পরিবারে নারীশিক্ষার প্রচলন তেমন না থাকলেও ইনি কিছুদূর লেখাপড়া করেছিলেন। সুরেরও বেশ কান ছিল, নজরুলের বাঁশি বাজানো খুব পছন্দ করতেন। ভাবী স্ত্রীর নাম নজরুল নতুন করে রাখলেন নার্গিস আসার খানম। আমাদের মনে পড়ে যায়, বাংলাদেশের আরেক মহান কবি স্ত্রীর নাম পাল্টে রেখেছিলেন : রবীন্দ্রনাথ বিবাহের পরে পত্নী ভবতারিণীর নামকরণ করেন মৃণালিনী দেবী। যাই হোক, বিবাহ হয়ে গেলেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদও হয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে কনের মামা ছদ্মবন্ধু আলি আকবর খানের সমস্ত দুরভিসন্ধি নজরুল ধরে ফেলেন। সদ্য-বিবাহিত স্ত্রীকে ত্যাগ করে তখন বিয়ের আসর ছেড়ে চলে এসেছিলেন কবি। আর কখনও তিনি ফিরে যান নি, পরে তালাকনামা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক পরে ভদ্রমহিলার বিবাহ হয়েছিল আরেক জন কবির সঙ্গে, তাঁর নাম আজীজুল হাকিম। ঢাকা শহরে কলতাবাজারে থাকতেন, কিছু শিশুপাঠ্য বইও লিখেছিলেন নার্গিস আসার খানম। যে-বিবাহ হয়তো সুখের হতে পারত তা অপরের চক্রান্তে এভাবে ভণ্ডুল হয়ে গেল। তবু দু' মাসের গ্রামীণ জীবন একেবারে ব্যর্থ হয় নি, অনবদ্য কিছু কবিতা রচিত হয়েছিল এ-সময়ে, ছোটোদের জন্যেও কিছু কবিতা।

দৌলতপুর ছেড়ে এলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ফেরা হল না। দৌলতপুর তো গ্রাম, কলকাতায় যেতে হলে কুমিল্লা শহরে না এসে উপায় নেই। নজরুল কুমিল্লায় এসে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। সেনগুপ্ত মহাশয় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন এবং এঁর পুত্র বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন আলি আকবর খানের সহপাঠী। দৌলতপুরে যাওয়ার পূর্বে খান সাহেব কবিকে নিয়ে এঁদের বাড়িতেই প্রথমে উঠেছিলেন এবং তখনই নজরুল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুর ব্যবহার ও মজলিশি চরিত্রের গুণে বাড়ির সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। বিবাহ উপলক্ষে সেনগুপ্ত পরিবারের সকলেই নিমন্ত্রিত হয়ে দৌলতপুরে গিয়েছিলেন এবং এঁদেরই সঙ্গে কবি ফিরে আসেন কুমিল্লায়, নৌকাযোগে। বিয়ের কেলেঙ্কারি নিয়ে কবি তখন মর্মাহত, অপমানিত ও মানসিকভাবে অত্যন্ত বিচলিত। খুবই স্বাভাবিক যে কবিকে এ-অবস্থায় বাড়ির কেউ ছেড়ে দেন নি। সেনগুপ্ত পরিবারে আদরযত্ন ও শহরের তরুণ সমাজের আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার কবির দুঃখ ও অশান্তি ঘোচাতে সাহায্য করেছিল। এই পরিবারটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা পরে সুদূরপ্রসারী হবে। এই বাড়িরই মেয়ে আশালতা, —ডাকনাম দোলন বা দুলী, এঁকেই কবি বিবাহ করলেন বছর তিনেক পরে। ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিধবা পত্নী গিরিবালা দেবীর মেয়ে আশালতার নাম পাল্টে গিয়ে হল প্রমীলা।

সতেরো দিন তিনি কুমিল্লায় থাকলেন। কবিতা, গান, আড্ডায় চমৎকার সময় কেটেছিল। তখন সারা দেশব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলছে, তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমগ্র দেশের যুবসমাজ, কুমিল্লাও বাদ যায় নি। আন্দোলন, সভা, মিছিল লেগেই আছে। নজরুল কবিতা লিখলেন, যোগ দিলেন মিছিলে, গান গাইতে-গাইতে প্রদক্ষিণ করলেন সারা শহর :

এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙ্গিনায় :
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায় ॥

অধীন দেশের বাঁধন-বেদন
কে এলো রে ক'রতে ছেদন ?
শিকল-দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায় ॥

... ...
পথের বাধা স্নেহের মায়ায়
পায় দ'লে আয় পায় দ'লে আয়!
রোদন কিসের? — আজ যে বোধন!
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান আয় রে আয় ॥

এই সময়ে কুমিল্লায় তিনি আরো কয়েকটি বিখ্যাত গান রচনা করেছিলেন, যেমন 'মরণ-বরণ', 'বন্দী-বন্দনা'। দুটি গানই চরম উদ্দীপনাময় ও দেশাত্মবোধে প্রোজ্জ্বল। 'মরণ-বরণ'-এ তিনি আহ্বান জানালেন :

এস এস এস ওগো মরণ!
এই মরণ-ভীতু মানুষ-মেষের ভয় কর গো হরণ ॥

না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,

তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বুকের 'পরে
ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন-ভরা চরণ ॥

দীপক রাগে বাজাও জীবন-বাঁশী,
মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি'!
কাঁধে পিঠে কাঁদে যেথা শিকল জুতোর ছাপ,
নাই সেখানে মানুষ সেথা বাঁচাও মহাপাপ!
সে দেশের বুকে শ্মশান মশান জ্বালুক তোমার শাপ,
সেথা জাগুক নবীন সৃষ্টি আবার হোক নব নাম-করণ ॥

আর বন্দনা করলেন তাঁদের যাঁরা দেশমাতৃকার শৃঙ্খল ঘোচানোর জন্য নিজেদের পায়ে শৃঙ্খল পরেছে ব্রিটিশের কারাগারে :

আজি রক্ত নিশি-ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি-হাসি হাসে,
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া-তলে ॥
... ...

কোরাস :

জয় হে বন্ধন-মৃত্যু-ভয়-হর! মুক্তি-কামী জয়!
স্বাধীন-চিত জয়! জয় হে!!
জয় হে! জয় হে! জয় হে!

কুমিল্লায় সময় ভালো কাটলেও মানসিক অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না — হাতে যে একেবারেই পয়সা নেই। কলকাতায় ফিরবেন কী করে? অগতির গতি কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদকে চিঠি লিখলেন সব ঘটনা জানিয়ে। তিনি ধার-দেনা করে টাকা জুটিয়ে কুমিল্লায় চলে এসে নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন।

কলকাতায় এসে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গেই থাকতে লাগলেন ৩/৪ সি, তালতলা লেনে। শেষ বারের মতো দু' বন্ধু একত্র বসবাস; পরে আর কখনও দু'জনে একসঙ্গে থাকার সুযোগ পান নি। এ সময়েই কোনো এক দিন বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে গেলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। নজরুলকে দেখতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'শাত-ইল-আরব' ও 'খেয়াপারের তরণী' ততদিনে বেরিয়ে গেছে। সকলে আনন্দ ও উত্তেজনায় লক্ষ করছেন নতুন কবির অভ্যুদয়।

১৯২১ সালের নভেম্বর মাস। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাট প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ভারতভ্রমণে আসছেন, পরে ইনি অষ্টম এডওয়ার্ড নামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসবেন। সারা ভারত উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। গান্ধীজী ডাক দিয়েছেন অসহযোগ আন্দোলনের।

কে এই গান্ধীজী? অসহযোগ কী? সংক্ষেপে বলা বেশ কঠিন। আমার মনে হয়, এই ব্যক্তি ও এই আন্দোলন বিষয়ে তোমরা নিশ্চয়ই কমবেশি কিছুটা জান। আর যদি সত্যিই

এমন হয় যে এই প্রথম তুমি শুনলে, তা হলে যে-ভাবেই পার ইতিহাসের বই খুঁজে পেতে পড়ে নিতেই চাও। কারণ, গান্ধীজী বা অসহযোগ তো কেবল এক জন বিখ্যাত লোক বা একটা আন্দোলনের নাম নয়; এ হচ্ছে ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের এক বিরাট অংশ। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামে এক গুজরাটি বৈষ্ণব কী করে সারা দেশবাসীর মনে 'মহাত্মা'র আসন লাভ করেন, কীভাবে ইংরেজি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এই ব্যারিস্টার ভদ্রলোক সব অহংকার ও অভিমান ত্যাগ করে খালি গায়, চটি পায়, আর খাটো এক চিল্‌তে ধুতি পরে প্রায় দিগ্বিজয় করলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দিলেন— সেও এক চমকপ্রদ কাহিনী, শিক্ষণীয় বিষয়। আর অসহযোগ? এই আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীই তৈরি করেছিলেন : হিংসার পথে নয়, সন্ত্রাসবাদের পথে নয়, অহিংসার আন্দোলন দিয়ে দেশকে জাগাতে হবে, ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করতে হবে— এটাই হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলনের মূল বাণী। কিন্তু কোন উপায়ে অসহযোগ? ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে ভারতবাসীরা কোনো ব্যাপারেই সহযোগিতা করবে না : সরকারের দেওয়া খেতাব ত্যাগ করবে, অফিস-আদালতে কাজ করবে না, ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যাবে না, বিলেতি কাপড় কেউ আর পরবে না— ঘরে থাকলে, দোকানে থাকলে, সব পুড়িয়ে ফেলবে।

সে-যুগে যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে উড়োজাহাজ চালু হয় নি; বিদেশ থেকে ভারতে আসতে হত জলপথে, জাহাজে চড়ে। ভাবী সম্রাটকে নিয়ে জাহাজ বোম্বাই বন্দরে ভিড়ল ১৭ই নভেম্বর তারিখে, অমনি শুরু হয়ে গেল তুমুল বিক্ষোভ। পুলিশের গুলিতে নিহত হল ৫৩ জন আর গ্রেফতার হল ৪০০ জন। এর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। আন্দোলন আরো তুঙ্গে উঠল। কুমিল্লাতেও জোর আন্দোলন চলছে। নজরুল চলে গেলেন সেখানে। ২১শে নভেম্বর হরতাল ও প্রতিবাদ-মিছিলে অংশ নিলেন। কবিতা লিখলেন 'জাগরণী', গান গেয়ে-গেয়ে ঘুরে বেড়ালেন মিছিলের সঙ্গে সমস্ত শহর। ১৫৩ চরণের সুদীর্ঘ গান, একক কণ্ঠে ও সকলের সম্মিলিত কণ্ঠের কোরাসে বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত কোরাস গেয়ে উঠছে সবাই :

ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী,
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!
জাগো গো, জাগো গো,
তন্দ্রা-অলস জাগো গো,
জাগো রে! জাগো রে!

কোরাস শেষ হল তো একক কণ্ঠে উচ্চারিত হল আহ্বান :

মুক্ত করিতে বন্দিনী মা'য়
কোটি বীরসুত ঐ হের ধায়
মৃত্যু-তোরণ-দ্বার-পানে—
কার টানে?
দ্বার খোলো দ্বার খোলো!
একবার ভুলে ফিরিয়া চাও!
জননী আমার ফিরিয়া চাও!

কিশোর কবি

চুরুলিয়া মক্তবগৃহ

হাবিলদার কবি

প্রমীলা নজরুল

সপরিবারে নজরুল : কবিপত্নী প্রমীলা, দুই পুত্র সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ

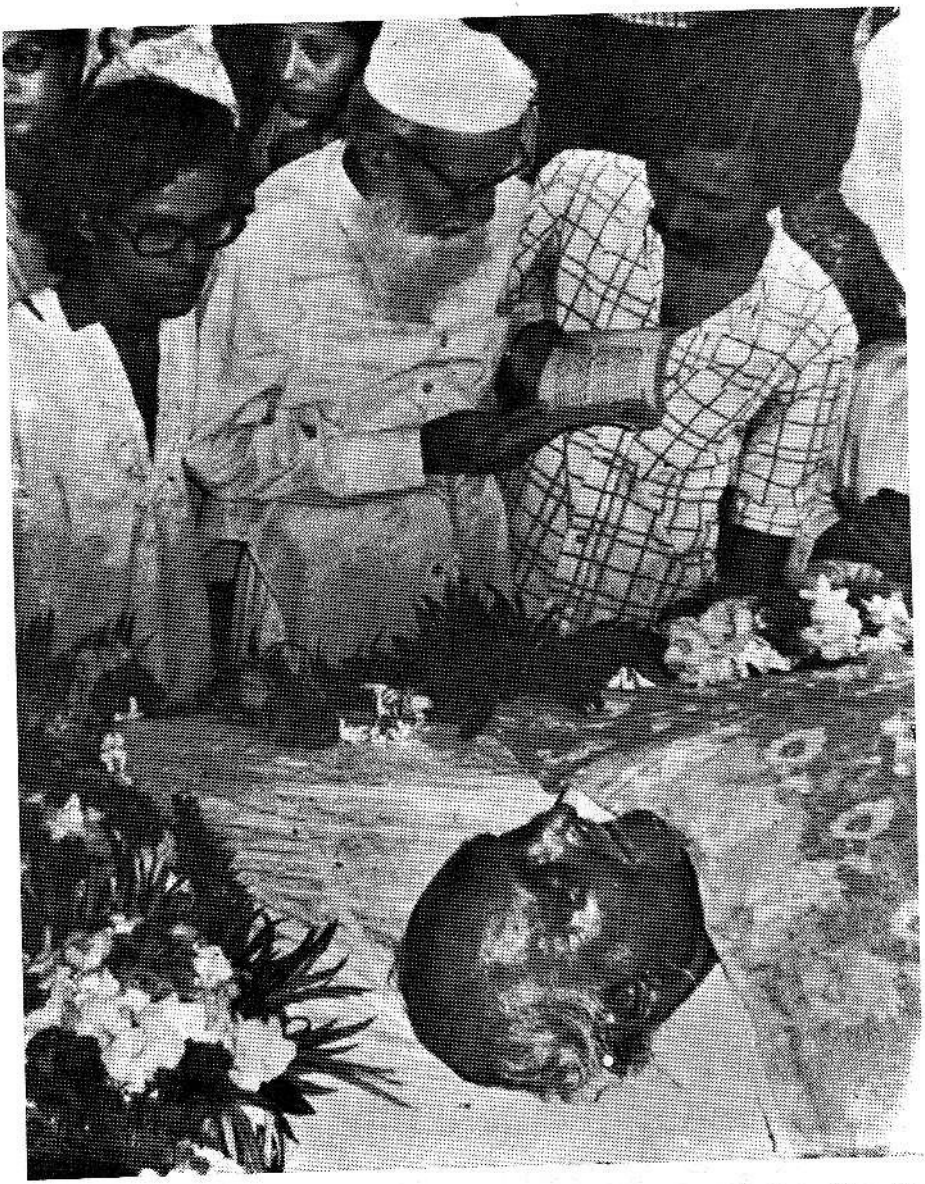

চিরনিদ্রায় শায়িত কবি

ভাইরা আমার ফিরিয়া চাও!
চাই মানবতা, তাই দ্বারে
কর হানি মা গো বারে বারে—
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!
পুরুষ-সিংহ জাগো রে !
সত্যমানব জাগো রে!
বাধা-বন্ধব-ভয়-হারা হও
সত্য-মুক্তি-মন্ত্র গাও!

এবারে কুমিল্লায় থাকলেন প্রায় এক মাস।

কুমিল্লা থেকে ফিরে এলেন ডিসেম্বর মাসে, কলকাতায় লিখিত হল 'বিদ্রোহী'। মাস দুয়েক পর ফের কুমিল্লায় গেলেন, এবারের অবস্থান প্রায় মাস চারেক। এবার রচিত হল 'বিদ্রোহী'র মতোই আরেকটি অনির্বচনীয় যুগান্তকারী কবিতা : 'প্রলয়োল্লাস'। কবিতাটিতে পরে সুর যোজনা করা হয়। আজ বঙ্গভাষাভাষী তরুণ সমাজের কণ্ঠে এই গান চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে। তোমরাও অনেকে নিশ্চয়ই জান। আমি এখানে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি :

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধুপারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙ্‌ল আগল!
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে—
ধূম্র-ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর—
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
... ...
ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? — প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন — জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় ব'য়েও আসছে হেসে'—
মধুর হেসে।
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর?

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর্!
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

কবি যখন কুমিল্লায় তখন কলকাতায় একটা ঘটনা ঘটল : মার্চ মাসে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম গ্রন্থ। না, কবিতার বই নয়, গল্পগ্রন্থ। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'মোসলেম ভারত' এবং 'নূর' পত্রিকাতে যে-সব গল্প বেরিয়েছিল সেগুলো একত্রিত করে 'ব্যথার দান' প্রকাশ করলেন আফজালুল হক। নজরুলের যাবতীয় গদ্যগ্রন্থের মধ্যে 'ব্যথার দান' সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৫

প্রায় চার মাস কুমিল্লায় কাটিয়ে নজরুল ফিরে এলেন কলকাতায়। দেশের ভাবনা, সন্ত্রাসবাদের বিদ্যুৎবহ্নি, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক তাঁর হৃদয় ও মন অধিকার করে আছে তখন। দেশের রাজনীতিতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তাঁর সমস্ত অনুভব উদগ্রীব হয়ে আছে। ওদিকে 'সেবক' পত্রিকায় যে-ধরনের রচনা তিনি লিখতে চাইছিলেন তাও সম্ভব হল না কর্তৃপক্ষের ভিন্ন ধরনের মত ও আচরণের জন্যে। এমন সময়ে এক জন প্রস্তাব নিয়ে এলেন একটা কাগজ বের করার। অচেনা অজানা লোক, স্বভাব-চরিত্র কিছু জানা নেই, তথাপি এ-প্রস্তাব তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। কবির তখন দারুণ অর্থকষ্ট, তাই মনে হতে পারে যে পত্রিকা প্রকাশ করে তিনি অসচ্ছলতা দূর করতে চাইছিলেন। ঘটনা কিন্তু মোটেই সে-রকম নয়। যিনি প্রস্তাব এনেছিলেন তাঁর মূলধন ছিল হাস্যকর রকমের কম—মাত্র আড়াই শ' টাকা; উপরন্তু এই অঙ্কের সবটা তিনি নজরুলকে দেন নি, দিয়েছিলেন দু' শ' টাকা। ভদ্রলোককেও কিছুদিন পরে খুঁজে পাওয়া গেল না, আরো পরে জানা গিয়েছিল যে লোকটি ছিল পুলিশের গুপ্তচর। রাজনীতির ক্ষেত্রে সরকারবিরোধী সন্দেহজনক ব্যক্তিদের ওপর নজর রাখার উদ্দেশ্যে পুলিশের লোক এভাবেই বন্ধু সেজে আসত, এখনও এসে থাকে। যাই হোক, নজরুলের এত চিন্তা বা হিসেবের সময় কোথায়? তাঁর একমাত্র ভাবনা পত্রিকা বের করা— আগে তো বেরুক, পরের চিন্তা পরে! পত্রিকা বেরুল। নজরুল নাম রাখলেন 'ধূমকেতু'। সপ্তাহে দু' বার বেরুবে, অর্থাৎ অর্ধসাপ্তাহিক সংবাদপত্র। চার পাতা বা আট পৃষ্ঠার কাগজ, ক্রাউন ফোলিও সাইজ অর্থাৎ লম্বায় ১৫ ইঞ্চি আর চওড়ায় ১০ ইঞ্চি মাপের। প্রতি সংখ্যার দাম এক আনা, আর সংবৎসরের গ্রাহক-চাঁদা পাঁচ টাকা। নিজেকে নজরুল কাগজের সম্পাদক বললেন না, বললেন, 'সারথি'।

প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পূর্বেই নজরুল বাণী চেয়ে চিঠি লিখলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। উত্তর এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে, আট পঙ্‌ক্তির ছোট্ট একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন

রবীন্দ্রনাথ :

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন!
অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে'
আছে যারা অর্দ্ধচেতন!

কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই কবিগুরুর আশীর্বাণী নিয়ে 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হল ১৯২২ সালের ১১ই আগষ্ট (বাংলা ১৩২৯ সালের ২৬শে শ্রাবণ) তারিখে। এবং প্রথম সংখ্যা থেকেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল 'ধূমকেতু'। প্রকৃতপক্ষে জনপ্রিয়তার কারণেই কাগজটি বন্ধ হয় নি; কাগজে বিজ্ঞাপন পাওয়া গেল, কাট্‌তি হল প্রচুর। বিজ্ঞাপন আর বিক্রির পয়সাতেই পত্রিকা চালানো সম্ভব হয়েছিল।

তা না হয় হল কিন্তু 'ধূমকেতু' কেন জনপ্রিয়? কী লেখা হত এই পত্রিকায়? কারা কিনতেন এই কাগজ? আসলে যেমন নাম তেমনি কাম। 'ধূমকেতু'র রচনা যেন উল্কার স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি। রেখে-ঢেকে কোনো কথা বলা নয়, কাউকে ভয় করে কোনো কথা বলা নয়। সরাসরি রাজনীতির কথা, দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট ভাষায় বিদ্রোহের ডাক। নজরুল একাই এক শ' : কখনও লিখছেন সম্পাদকীয়, কখনও কবিতা, কখনও-বা প্রবন্ধ। একটি সংখ্যায় তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন :

> সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।
>
> স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লীর অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয় নি এখনো। আমাদেরো এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।

এরকম লিখতে পারা তখন কম সাহসের ব্যাপার নয়। মহান উর্দু কবি মৌলানা হসরৎ মোহানি এক বৎসর পূর্বে এমন কথা উচ্চারণ করায় কঠিন মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, এবং নজরুল সেই ঘটনা জানতেন, কিন্তু তিনি তোয়াক্কা করেন নি। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ অত্যন্ত খাঁটি কথা বলেছেন যে,

> অনেকে হয়তো নিজেদের বৈঠকখানায় বসে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিংবা হয়তো গোপন ইশ্‌তিহার ছেপে তার মারফতে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু এমন দ্ব্যর্থহীন, চাঁছাছোলা ভাষায় খবরের কাগজে ঘোষণা ক'রে বাঙলা দেশে নজরুলের মতো আর কে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে তুলে ধরেছিলেন তা আমার জানা নেই।

কাগজ বেরুবার দেড় মাস পরেই নজরুল একটি কবিতা লিখলেন 'ধূমকেতু'তে : "আনন্দময়ীর আগমনে", উনআশি পঙ্‌ক্তির দীর্ঘ কবিতা। ভীরুদের প্রতি প্রচণ্ড ধিক্কার, ব্রিটিশ-সমর্থকদের প্রতি দুর্বার ঘৃণা, আর দেশপ্রেমীদের কাছে বিদ্রোহের ডাক— এই হল কবিতার মূল সুর। ফল যা হবার তাই হল, সরকারের টনক নড়ল। পুলিশ এসে তল্লাশি করে গেল 'ধূমকেতু'র অফিস, পত্রিকার সমস্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হল, নিষেধাজ্ঞা জারি হল কবিতাটির ওপর, অর্থাৎ "আনন্দময়ীর আগমনে" আর কখনো কোথাও ছাপা যাবে না। অল্প কিছুদিন পূর্বে এমনিভাবেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল কবির প্রবন্ধগ্রন্থ 'যুগবাণী'। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে 'যুগবাণী' যেমন পুনরায় মুদ্রিত হতে পারে নি, একইভাবে তেমনি "আনন্দময়ীর আগমনে" কবিতাও কবির কোনো কাব্যগ্রন্থেই সংকলিত করা সম্ভব হয় নি। কবির বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কী-রকম জ্বালাময়ী রচনা প্রকাশিত হত ঐ অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকায়। আর, পত্রিকা কিনতেন তাঁরাই যাঁরা মনে করতেন— বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ুক চারদিকে, সেই আগুনে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাক বিদেশী শাসনের জোয়াল, আর সেই আগুনে স্নাত হয়ে দেশবাসী হয়ে উঠুক যথার্থ দেশপ্রেমিক, খাঁটি সোনা। স্বদেশী আন্দোলনের যে-জোয়ার নজরুল তাঁর কৈশোরে, পল্টনে যাওয়ার সময়ে, দেখেছিলেন তা মাঝখানে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। নজরুল আবার মনে করিয়ে দিলেন পুরনো দিনের স্বপ্ন, অপরাজেয় আশা। 'ধূমকেতু' সবচেয়ে প্রিয় ছিল সেই তরুণ সমাজের কাছে যারা ছিল সন্ত্রাসবাদে, চরমপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। বাংলা জুড়ে ফের নতুন করে যে স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের হাওয়া বইবে, তার পিছনে 'ধূমকেতু'র অবদান কম নয়।

এসব ঘটনা যখন ঘটছে নজরুল তখন কলকাতাতেই। এ সময় তাঁকে অনেকে পরামর্শ দেন যে তিনি যদি চান তা হলে য়োরোপে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়তো করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু নজরুল এই প্রস্তাবে সম্মত হন নি। তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে দেশের বাইরে গিয়ে স্বার্থপরের মতো নিজের প্রাণ বাঁচানো হয়তো চলে, দেশোদ্ধার করা চলে না। এমনকি তিনি লুকিয়েও থাকলেন না, তবে শুভার্থীদের পরামর্শে কলকাতার পুলিশের চোখের আড়ালে হলো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রেহাই পেলেন না, প্রায় দু' মাস পরে কুমিল্লা থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে কলকাতায় নিয়ে এল। কোর্টে বিচার শুরু হল। বিচারের দিন ম্যাজিস্ট্রেট ও অসংখ্য জনতার সম্মুখে কবি তাঁর জবানবন্দি লিখিতভাবে পাঠ করলেন। জবানবন্দি মানে আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি— তিনি দোষী না নির্দোষ সেই কথা বলা। বাংলা ভাষায় এ-ধরনের রচনা আর কাছে কিনা সন্দেহ। যেমন তীক্ষ্ণ আবেগমন্দ্রিত ভাষা, তেমনি নির্ভীক বক্তব্য। তিনি বললেন :

> আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজ-বিদ্রোহী! তাই আমি আজ রাজ-কারগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।
>
> এক ধারে রাজার মুকুট; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। এক জন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আর জন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে নিযুক্ত রাজ-বেতনভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধ'রে সত্য — জাগ্রত ভগবান।
>
> ... ...
>
> আমি জানি এবং দেখেছি— আজ এই আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় একা আমি দাঁড়িয়ে নেই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্যসুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি

নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য-সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজ-নিযুক্ত বিচারক সত্য বিচারক হ'তে পারে না। এমনি বিচার-প্রহসন করে যেদিন খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হ'ল, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হ'ল, সেদিনও ভগবান এমনি নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পশ্চাতে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায় নি, তার আর ভগবানের মধ্যে তখন সম্রাট দাঁড়িয়ে ছিলেন, সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হ'য়ে গেছিল। নইলে সে তার ঐ বিচারাসনে ভয়ে বিস্ময়ে থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ত, নীল হয়ে যেত, তার বিচারাসন সমেত সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

... ...

.. জিজ্ঞাসা করছি— এই যে বিচারসন— এ কার? রাজার না ধর্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে, ভগবানকে? এই বিচারককে কে পুরস্কৃত করে? রাজা, না ভগবান? অর্থ, না আত্মপ্রসাদ?

ঐ জবানবন্দির ভিতরে তিনি আরো বললেন :

আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংলণ্ডই ভারতের অধীন হ'ত এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংলণ্ড-অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মত অধীর হয়ে উঠ্‌ত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার মতই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হ'য়ে আমার সম্মুখে এই বিচারক বিচারার্থ নীতি হতেন, তা হ'লে সে সময় এই বিচারক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমিও তাই এবং তেমনি করেই বলছি।

দীর্ঘ রচনার অংশবিশেষ শুধু এখানে উদ্ধৃত করা হল। "রাজবন্দীর জবানবন্দী" শিরোনামে কবির এই আত্মপক্ষ-সমর্থন 'ধূমকেতু'তেই পরে ছাপা হয়েছিল। তা ছাড়া আলাদাভাবে পুস্তিকা আকারে ছাপিয়ে হাজার হাজার কপি বিক্রি করা হয়েছিল।

শেষ হল বিচারের প্রহসন। বিচারের রায় বেরুল— এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। কবিতা রচনার জন্য কারাবরণ কোনো বাঙালি কবির ভাগ্যে এই প্রথম ঘটল।

নতুন এক পর্ব শুরু হল নজরুলের জীবনে। গৌরবোজ্জ্বল সে-কাহিনী।

মামলার রায় বেরিয়েছিল ১৯২৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি। বিচারাধীন অবস্থায় এ ক' মাস তিনি ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। পরের দিন ১৮ই জানুয়ারি তাঁকে বদলি করা হল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে, কলকাতা শহরেরই মধ্যে। নিয়ম অনুযায়ী রাজবন্দির বিশেষ সম্মান তাঁকে দেওয়া হল। অর্থাৎ সামাজিক অপরাধ—যেমন চুরি ডাকাতি খুনখারাবি— করে যারা জেল খাটে তাদের চেয়ে ভিন্ন মর্যাদায় ভদ্রভাবে রাখার ব্যবস্থা হয় রাজনৈতিক কারণে বন্দিদের ক্ষেত্রে; সেই নিয়মই প্রযোজ্য হল বন্দি কবির বেলায়।

কবি নজরুল ইসলাম কারারুদ্ধ রাজনৈতিক কারণে— এই সংবাদে তখন সারা দেশ তোলপাড়। রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করে বসলেন তাঁর নাটিকা "বসন্ত" "শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু"কে। নজরুলের বন্ধু পবিত্রকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে বইটি পৌঁছে দিতে বললেন বিদ্রোহী কবিকে। স্মৃতিচারণ করেছেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় :

কে যেন দু কপি 'বসন্ত' এনে দিল কবির হাতে। তিনি একখানায় নিজের নাম দস্তখত করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'তাকে বলো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ

জানাচ্ছি। আর বলো, কবিতা লেখা যেন কোন কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা যোগাবার কবিও তো চাই।'

জেলের ইণ্টারভিউ— নিয়ম মাফিক গরাদের ব্যবধানে আমি প্যাকেট খুলে গুরুদেবের উৎসর্গ-পত্র দেখাতেই নজরুল লাফ দিয়ে পড়ল লোহার গরাদগুলির উপর। বন্দীর প্রবল উত্তেজনা লক্ষ্য করে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার কারণ জানতে চাইল। আমি যখন বললাম, পোয়েট টেগোর ওকে একখানা বই ডেডিকেট করেছেন, সাহেব আমার ইংরেজির ভুল ধরে বলল, ইউ মীন— প্রেজেণ্টেড। আমি জোর দিয়ে বললাম, নো, ডেডিকেটেড।

সাহেবের মুখে বিস্ময়। ইউ মীন দি কনভিক্ট ইজ্ সাচ্ এ্যান ইম্পর্ট্যাণ্ট পার্সন?

ইয়েস, আওয়ার গ্রেটেস্ট পোয়েট নেক্সট্ টু টেগোর।

এক সেকেণ্ড কি ভেবে সাহেব দরজাটা খুলে আমাদের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করল নজরুল। তার পর হঠাৎ খেয়াল হতে ছিটকে পড়া বইখানা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বুকে চেপে ধরল। ... উত্তেজনা একটু প্রশমিত হতে নজরুল জিজ্ঞাসা করল, আর কি বলেছেন গুরুদেব?

বলেছেন— তুই যেন কবিতা লেখা বন্ধ করিস না।

গুরুর আদেশ শিরোধার্য বলে সেদিন আমাকে বিদায় করেছিল নজরুল।

না, কবিতা লেখা থামে নি নজরুলের । আলিপুর জেলে বসেই লিখলেন বিখ্যাত কবিতা "আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে":

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে—
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আস্‌ল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

'কল্লোল' পত্রিকায় আটচল্লিশ পঙ্‌ক্তির এই কবিতা ছাপা হল। যোগ্য স্থানের যোগ্য কবিতা : যেমন পত্রিকার নাম, তেমনি কবিতার ভিতরের উত্তাল কলরোল। 'কল্লোল'-এর গল্প পরে বলা যাবে।

কলকাতার জেল থেকে মাস কয়েক পরে নজরুলকে হুগলি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে অন্যান্য আরো রাজবন্দি ছিলেন। আসলে হুগলি জেলে তাঁদের নিয়ে যাওয়ার কথা নয়, কেননা ঐ জেলে রাজবন্দিদের পাঠানো হত না, পাঠানো হত মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের জেলখানায়। তাঁদের মিথ্যা কথা বলা হয়েছিল। তাঁরা জানতেন যে, বহরমপুর জেলেই তাঁরা যাচ্ছেন। হুগলি জেলে কবির আগমনের ঘটনাটা চমকপ্রদ বটে! কবি-বন্ধু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :

... ডোরাকাটা হাফ পাঞ্জাবি, উক্ত কাপড়ের ইজের, আর ঐ কাপড়েরই গামছার মতো গা-মোছা চাদর, বিষম কুট্‌কুটে খোঁচা খোঁচা লোমের কম্বল সহ এই অপরূপ পোশাকে জেল কর্তৃপক্ষ বাংলার জাতীয় জাগরণের কবিকে সাজিয়ে কয়েদীর গাদিতে ছেড়ে দিল।

কবি কলকাতার জেল থেকে হুগলী জেলে এলেন। কবিকে আনা হয়েছিল কোমরে দড়ি বেঁধে। জেলখানায় ঢুকেই উদাত্ত স্বরে 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে হাঁক ছাড়লেন। রাজনৈতিক বন্দীরা সচকিত হয়ে শুনলো বিদ্রোহী কবি নজরুল হুগলী জেলে পদার্পণ করেছেন। সকলেই কবির আগমনে বন্দীদশার একঘেয়েমিতে বৈচিত্র্যের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

যাই হোক, সব জেলখানাই সমান— আলিপুর, বহরমপুর বা হুগলি, একই কথা। বন্দিদশা তো সবখানেই। কিন্তু গণ্ডগোল লাগল অন্যত্র : হুগলি জেলে নিয়ে এসেই তাঁদের বলা হল যে তাঁরা রাজবন্দি নন, সাধারণ কয়েদি মাত্র। রাজবন্দিদের যে-সব অধিকার থাকে, যেমন জেলের ভিতরেও মোটামুটি ভদ্রভাবে ভদ্রপরিবেশে থাকা, স্বাস্থ্যের ক্ষতি যাতে না হয় সে-রকম খাবারদাবার পাওয়া ইত্যাদি— সমস্ত কিছুই খর্ব করা হল। এখন থেকে তাঁদের পরতে হবে কয়েদির পোশাক— জাঙ্গিয়া আর খাটো কুর্তা, খাওয়াদাওয়া সারতে হবে লোহার থালায়। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও নিতান্ত জঘন্য। সপ্তাহে এক দিন মাছ ও এক দিন মাংসের বরাদ্দ ছিল, অথচ সকল কয়েদিই পেত ঝোল, কাঁটা, আর হাড়। নজরুলের বন্ধু প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

... বুড়ো ডাঁটা, কপির শুকনো পাতা, ফুটে যাওয়া ফুলকপি, দরকচা-ধরা বেগুন, ঝিঙে, আধপচা লাউ, কুমড়ো আর তরকারির খোসা প্রভৃতিতে কয়েদীদের রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা হ'তো। ... আর তরকারির খোসা; ক্ষুদ ও ধানের 'কুন' মিশিয়ে সেদ্ধ করে ভোরের দিকে সান্‌কি থেকে সান্‌কিতে ঢেলে দিয়ে যেতো 'ফালতুরা"। তার রং ছিল কালো, আস্বাদের তো কোনো বালাই ছিল না। জেল-জীবনে হুগলীর কয়েদীদের ঐটাই ছিল পরম পদার্থ 'লপসী' ব্রেকফাষ্ট।

প্রথমত, নিয়ম ভঙ্গ করে এই অসম্মান, দ্বিতীয়ত জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ আর্সটনের অকথ্য দুর্ব্যবহার; প্রতিবাদ না করে রাজবন্দিদের আর উপায় থাকল না। প্রতিবাদের ফলে কিন্তু কর্তৃপক্ষের ব্যবহার জঘন্যতর হয়ে উঠল। এ-সময়ের হুগলি জেলের অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা আছে "যুগস্রষ্টা নজরুল" নামে একটি বইয়ে। লিখেছেন খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন। এঁকে কি তোমরা চিনতে পারছ? ইনি কবি ও লেখক, এঁর প্রায় সমস্ত রচনাই তোমাদের জন্য লেখা। সেদিনের এই আঠারো-উনিশ বছরের তরুণ কবি 'মোসলেম জগৎ' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে 'বিদ্রোহ' নামে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে ছ' মাসের জন্য জেল খাটতে গেছেন, ঐ একই জেলে।

অত্যাচার বাড়ল, তথাপি রাজবন্দিদের ভয় দেখানো গেল না। অদ্ভুত একটি গান রচনা করলেন নজরুল :

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার এ গান তোমারি ধ্যান তুমি ধন্য ধন্য হে ॥
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার-কক্ষে জামাই-আদরে
বেঁধেছে শিকল প্রণয়-ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে ॥

আঁ-কাঁড়া চালের অন্ন-লবণ

www.alorpathsala.org

করেছ আমার রসনা-লোভন,
বুড়ো ডাঁটা-ঘাঁটা লাপ্‌সী শোভন,
তুমি ধন্য ধন্য হে ॥
ধর ধর খুড়ো চপেটা মুষ্টি,
খেয়ে গয়া পাবে সোজা সে-গুষ্টি,
ওল-ছোলা দেহ ধবল-কুষ্টি
তুমি ধন্য ধন্য হে ॥

রবীন্দ্রনাথের একটি দেশাত্মবোধক গান আছে : "তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে তুমি ধন্য ধন্য হে"। নিজের প্রিয় কবির গান অবলম্বনে প্যারডি তৈরি করেছিলেন নজরুল। শুধু গান লেখা নয়, বড়োকর্তা আর্সটন জেল-তদারকিতে এলে তার নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে সকলে গানটি গেয়ে উঠতেন। গানটির নাম দিয়েছিলেন তিনি 'সুপার (জেলের)-বন্দনা'; এ-নামের ভিতরেও ব্যঙ্গ আছে; super-বন্দনা, মানে শ্রেষ্ঠ বন্দনা। ব্যাপারটা অবশ্যই হাসি-ঠাট্টার নয়। ব্যঙ্গ কবিতা লিখে বা গান গেয়ে নিষ্ঠুর কর্তৃপক্ষের বিবেক জাগ্রত করা যায় না। জেলখানার দুর্বিষহ জীবনকে যতটুকু সহনীয় করা যায়, এ ছিল তারই এক উপায়। এই কৌশলের ভিতরে নিজেদের আনন্দলাভের উপকরণ ছিল, জেল-কর্তৃপক্ষকে বেঁধবার মতো একটু হুলও তাতে নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু জেলখানার অমানুষিক নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পদ্ধতি হিসেবে এত পেলব অস্ত্র নিতান্তই অচল। গান তো শুধু ঐ প্যারডি নয়, আগুন-ঝরা গানও তিনি লিখলেন ঐ হুগলি জেলে বসেই :

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥

তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
... ...
ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা,
এ যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা!
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্‌ছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বল্‌বে দেশে আবার বহ্ন্যানল ॥

কিন্তু তাতে লাভ হল কী? জেলখানার লোকজনকে কি এত সহজে ভয় পাওয়ানো যায়? উপায় না দেখে চরম অস্ত্র প্রয়োগ করলেন নজরুল। অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন।

বন্দিদশার পাঁচ মাস চলছে তখন। হুগলি জেলে কেটেছে মাত্র এক সপ্তাহ; অনশন শুরু করলেন ২১শে এপ্রিল থেকে। জেলের ভিরে বসে কেউ অনশন শুরু করলে কর্তৃপক্ষ ভীষণ বিপদে পড়ে। কারণ, যদি অনশনের ফলে বন্দির মৃত্যু হয়? যে-লোক সরকারবিরোধী, জনগণকে খেপিয়ে তোলে, দেশের ও জনগণের স্বার্থে সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তেমন ব্যক্তি মারা গেলে সব সরকারই মনে মনে খুশি হয়; ভাবে যে— আপদ গেল! কিন্তু জেলের মধ্যে মারা গেলে লোকজন বলবে যে সরকারই মেরে ফেলেছে। কোনো সরকারই এই দোষ নিজের ঘাড়ে নিতে চায় না। সে-কারণেই কোনো বন্দি অনশন শুরু করলে জেলকর্তৃপক্ষ অনশন ভাঙাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এ ক্ষেত্রে তো আবার অনশনকারীর নাম কাজী নজরুল ইসলাম— এক জন কবি, এক জন সাংবাদিক, দেশের

এক বিখ্যাত ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, অনশন ভাঙানোর সব রকম চেষ্টা এখানেও চলল। কবিকে রাখা হয়েছে ৫ নম্বর সেল-এ— ঘরটি লম্বায় ছ' ফুট আর চওড়ায় চার ফুট। হাতে হ্যাণ্ডকাপ পড়ল, পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি পড়ল, হাত-পা-মাথা চেপে ধরে জোর করে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা — সবই চলল। দিন চলে যাচ্ছে, কবি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তাঁর সঙ্গে বাইরের কোনো লোককে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। বন্ধুদের কাছে তখনকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন কবিবন্ধু নলিনীকান্ত সরকার।

কে এই নলিনী? অপূর্ব পরিচয় দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তাঁর "কল্লোল যুগ" গ্রন্থে : "নলিনীকান্ত সরকার, আমাদের নলিনীদা। কৃষ্ণের যেমন বলরাম, নজরুলের তেমনি নলিনীদা। হাসির গানের তানসেন। নজরুল গায় আর হাসে, নলিনীদা গান আর হাসান। নজরুলের পার্শ্বাস্থি বলা যেতে পারে। নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, নলিনীদার কাছে সন্ধান নাও। নজরুলকে সভায় নিয়ে যেতে হবে, নলিনীদাকে সঙ্গে চাই। নজরুলকে দিয়ে কিছু করাতে হবে, ধরো আমার মতই নলিনীদাকে। নজরুল সম্বন্ধে সবচেয়ে ওয়াকিবহাল।" এই হচ্ছেন নলিনীকান্ত। চাকরি করতেন 'বিজলী' পত্রিকার অফিসে। আড্ডাবাজ মানুষ, চমৎকার গান গাইতে পারেন। তখন থেকেই বন্ধুত্ব। সেদিনের কথা গল্প করেছেন বন্ধুদের কাছে :

> শোনো সে মজার কথা। ... আটাশ দিনের দিন সবাই আমাকে ধরলে জেলে গিয়ে নজরুলকে যেন খাইয়ে আসি। জানতাম নজরুল মচকাবার ছেলে নয়, তবু ভাবলাম একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। গেলাম হুগলি জেলের ফটকে। আমি আর সঙ্গে, সকল অগতির গতি, এই পবিত্র। জেলে ঢুকতে পারলাম না, অনুমতি দিলে না কর্তারা। হতাশ মনে ফিরে এলাম হুগলি স্টেশনে। হঠাৎ নজরে পড়ল, প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষেই জেলের পাঁচিল উঠে গেছে। মনে হল জেলের পাঁচিলটা একবার কোনোরকমে ডিঙোতে পারলেই নজরুলের সামনে সটান চলে যেতে পারব। আর এভাবে জেলের মধ্যে একবার ঢুকতে পারলে সহজে যে বেরুনো চলবে না তা এই দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। তবু বিষয়টা চেষ্টা করে দেখবার মত। পবিত্রকে বললাম, তুমি আগে উবু হয়ে বোসো, আমি তোমার দু' কাঁধের উপর দু' পা রেখে দাঁড়াই দেয়াল ধরে। তারপর তুমি আস্তে আস্তে দাঁড়াতে চেষ্টা করো। তোমার কাঁধের থেকে যদি একবার লাফ দিয়ে পাঁচিলের উপর উঠতে পারি, তবে তুমি আর এখানে থেকো না। স্রেফ হাওয়া হয়ে যেয়ো। বাড়তি আরেক জনের জেলে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।
>
> বেলা তখন প্রায় দুটো, প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর আনাগোনা কম। 'য়্যাকর্ডিং টু প্ল্যান' কাজ হল। পবিত্রর কাঁধের থেকে পাঁচিলের মাথায় কায়ক্লেশে প্রমোশন পেলাম। প্রমোশন পেয়েই চক্ষু চড়কগাছ! ভিতরের দিকে প্রকাণ্ড খাদ— খাই প্রায় অন্তত চল্লিশ হাত। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি পবিত্রর নামগন্ধ নেই। যা হবার তা হবে, দু'দিকে দু'ঠ্যাং ঝুলিয়ে জাঁকিয়ে বসলাম পাঁচিলের উপর ঘোড়সওয়ারের মত। যে দিকে নামাও সেই দিকেই রাজি আছি — এখন নামতে পারাটাই কাম্যকর্ম। কিন্তু কই, জেলখানার ভিতরের মাঠে লোক কই? খানিক পর সামধ্যায়ী মশাইকে দেখলাম— মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী। বেড়াতে বেড়াতে একটু কাছে আসতেই চিৎকার করে বললাম, নজরুলকে ডেকে দিন। নজরুলকে।
>
> সার্কাসের ক্লাউন হয়ে বসে আছি পাঁচিলের উপর। জেলখানার কয়েদীরা দলে-দলে এসে মাঠে জুটতে লাগল বিনা টিকিটে সে-সার্কাস দেখবার জন্যে। দু'টি বন্দী যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে দুর্বল পায়ে টলতে টলতে নজরুলও এগিয়ে আসতে লাগল। বেশি দূর এগুতে পারল না, বসে পড়ল। গলার স্বর অতদূরে পৌঁছুবে না, তাই জোড়হাত করে

ইঙ্গিতে অনুরোধ করলাম যেন সে খায়। প্রত্যুত্তরে নজরুলও জোড়হাত করে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল এ অনুরোধ অপাল্য।

এ তো জানা কথা। এখন নামি কি করে? পবিত্র যে ঠিক "ধরো লক্ষণের" মতই অবিকল ব্যবহার করবে এ যেন আশা করেও আশা করি নি। গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার চেয়ে পাঁচিলে তুলে কাঁধ সরিয়ে নেওয়া ঢের বেশি বিপজ্জনক। কিন্তু ভয় নেই। স্টেশনের বাবুরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আমার চোদ্দপুরুষের— আদ্য কি করে বলি— শেষ শ্রাদ্ধ করছেন। ধরণী, সিধা হও, বলে পাঁচিল থেকে পড়লাম লাফ দিয়ে। স্টেশনের মধ্যে আমাকে ধরে নিয়ে গেল, পুলিশের হাতে দেয় আর কি। অনেক কষ্টে বোঝানো হল যে আমি সন্ত্রাসবাদীদের কেউ নই। ছাড়া পেয়ে গেলাম। অবিশ্যি তার পরে পবিত্র আর কাছছাড়া হল না—

না, বন্ধুবান্ধব কেউই নজরুলকে খাওয়াতে পারেন নি। চুরুলিয়া থেকে মা-কে সঙ্গে করে বড়ো ভাই সাহেবজান চলে এলেন, নজরুল তো মা-র সঙ্গে দেখাই করলেন না— পাছে মায়ের চোখের জল তাঁকে দুর্বল করে দেয়, লক্ষ্যভ্রষ্ট করে ফেলে। রবীন্দ্রনাথ খবর শুনে বিচলিত, তখন তিনি শিলংয়ে। টেলিগ্রাম পাঠালেন : Give up hunger strike. Our literature claims you [অনশনত্যাগ করো। আমাদের সাহিত্যের দাবি আছে তোমার কাছে]। সে-যুগের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এঁর বই নিশ্চয়ই তোমরা পড়েছ। পড় নি— বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, মেজদিদি, বড়দিদি, দেবদাস, শ্রীকান্ত? শুধু ঔপন্যাসিকই নন, তিনি ছিলেন নজরুলের মতোই চরমপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী, কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন দীর্ঘকাল। হুগলি রওয়ানা হওয়ার পূর্বে একজনকে চিঠিতে জানালেন : "হুগলি জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম উপোষ করিয়া মরমর হইয়াছে। বেলা ১টার গাড়িতে যাইতেছি। দেখি যদি দেখা করিতে দেয়। দিলে আমার অনুরোধে যদি সে খাইতে রাজি হয়। না হইলে কোন আশা দেখি না। এক জন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া বোধ হয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।" কলকাতায় ভারতবিখ্যাত জননেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জনসভা ডাকলেন। সেখানে নজরুলের অনশনের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে ধিক্কার জানানো হল। বক্তৃতা করলেন রাজনৈতিক নেতা, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক সকলেই। দাবি জানানো হল, কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে হবে নজরুলের দাবি মেনে নিতে; কারণ, একমাত্র তা হলেই কবি অনশন ত্যাগ করবেন, তাঁর বেঁচে থাকা প্রয়োজন দেশের সাহিত্যের জন্য। এক কথায়, 'ধূমকেতু'তে প্রবন্ধ লিখে দেশকে যতখানি সজাগ তিনি করতে পারেন নি ততখানিই সম্ভব করে তুললেন অনশনের মাধ্যমে।

এদিকে ক্রমশ দিন যাচ্ছে, আর কবির স্বাস্থ্য ও শক্তি শোচনীয় হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ঊনচল্লিশ দিনের মাথায় তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন। কুমিল্লা থেকে বিরজাসুন্দরী দেবী এসেছিলেন। ইনি ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের স্ত্রী, নজরুল এঁকে 'মা' ডাকতেন, এঁরই ভাশুর-কন্যা আশালতা ওরফে প্রমীলাকে কবি পরে বিবাহ করেছিলেন। বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধ ও মিনতিতে অনশন ভাঙতে বাধ্য হলেন তিনি।

অনশন ভঙ্গের পর কবিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বহরমপুরে। সেখানকার জেলখানায় রাজবন্দিরা থাকেন। ওখানে তো তাঁর যাওয়ার কথা বহু পূর্বেই, মধ্যিখানে আলিপুর জেলের বজ্জাতিতেই হুগলি জেলের দু' মাস চার দিন এই দুর্ভোগ কপালে ছিল। বহরমপুর জেলে

তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল ১৮ই জুন তারিখে। এবারে রাজবন্দির পূর্ণ মর্যাদা। ছ' মাস থাকতে হয়েছিল এখানে, সময়টা বেশ আনন্দেই কেটেছিল। আনন্দের কারণ বিখ্যাত সব রাজবন্দিদের সঙ্গে একত্র থাকতে পারছেন— কত জ্ঞানীগুণী মানুষ, অথচ কী নির্লোভ, এঁদের মধ্যে কত জনই তো ইচ্ছে করলে ব্রিটিশের গোলামি করে জীবনে পয়সাকড়ি করতে পারতেন, আরামে দিন কাটাতে পারতেন, অথচ সমস্ত ত্যাগ করেছেন শুধু দেশপ্রেমের জন্য। রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হয়, আলোচনা চলে দেশ-বিদেশের ইতিহাস নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে। মজলিশি আড্ডা বসে, হাসির ফোয়ারা ছোটে, নজরুল গান করেন। নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী তাঁর মতোই এক রাজবন্দি! কবি অবশ্য নন, জেলে জেলেই তাঁর জীবন কাটছে। আলিপুর ও বহরমপুর দু' জায়গার জেলেই কবিকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরে এ বিষয়ে একটি বইও লিখেছেন : "নজরুলের সঙ্গে কারাগারে"। জেলখানার আড্ডার এক ছবি এঁকেছেন তিনি, সে-আড্ডার 'মূল কথক' নজরুল। আর প্রসঙ্গ? সেই মুহূর্তে, রবীন্দ্রনাথ।

> ... আসর জমে উঠল। কাজী হাসতে হাসতে বললেন,— "একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলুম আর ছিলুমও দিন কয়েক। এক দিন দুপুরের পরে কবি বসে ছিলেন একা তাঁর 'দেহলী'র বারান্দায়। বেতের একখানা পিঠ-উঁচু চেয়ারে। পায়ের কাছে বসে তাঁর একখানা পা আমি টেনে নিয়েছিলাম কোলের ওপর। ইচ্ছে ছিল, একটু টিপে দেব। তারস্বরে কবি চেঁচিয়ে উঠলেন: 'ওরে ছাড় ছাড়। হাড়গোড় আমার ভেঙ্গে গেল।'
>
> "অপ্রস্তুতের একশেষ। সরে বসেছিলুম। আমার দিকে ফিরে চেয়েছিলেন কবি। চোখের তারা পিটপিট করছিলো। মুখে মৃদু হাসি। বলেছিলেন, — 'কটা গান লিখলে আজ? নাকি খালি চেঁচালেই?'
>
> "মুখ ভার করে মাথা নিচু করে আমি বসেছিলুম, — 'মাঝে মাঝে কী মনে হয়, জানেন?'
>
> 'কী?'
>
> 'একটা লাঠির বাড়ি মাথায় মেরে আপনাকে শেষ করে দি?'
>
> 'কেন? কেন?'
>
> 'তাহলে আপনার পাশাপাশি চিরকাল লোকে আমারও নাম করবে। আর আমার ছবি ও আপনার ছবির পাশেই ছাপা হবে!'
>
> 'কী সর্বনাশ! ওরে কে আছিস, শীগগির আয়। এ পাগলের অসাধ্য কিছু নেই।'
>
> "কবির কণ্ঠ একটু উঁচুই বা হয়েছিল! কয়েক জন এসেও পড়েছিল। সবিস্তারে কবি আমার কথার ফিরিস্তি শুনিয়ে দিলেন।"
>
> হাসতে হাসতে পেট খিল ধরে গিয়েছিল কাজীর গল্প শুনে।

শুধু এ-ধরনের বৈঠকি আসরই নয়, ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনাও তৈরি হচ্ছে এরই মাঝখানে। চক্রবর্তী মশাই তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন :

> তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৩। আজ সব স্থির হইয়া গেল। বাইরে যাইয়া আমরা, — পূর্ণবাবু, কাজী ও আমি চারণদল গড়িয়া তুলিব। কাজী পালা গাঁথিবেন, গানের সুর দিবেন, গান গাহিবেন। আমার উপর থাকিবে অভিনয়ের দায়িত্ব। পরিচালনার ভার থাকিবে পূর্ণবাবুর উপর।

কবি সম্ভবত সঙ্গীতবহুল ছোটো একটি নাটকও লিখেছিলেন এখানে বসে। উদ্দেশ্য— যে-চারণদল তৈরি হবে তারাই এই গান গেয়ে গেয়ে অভিনয় করতে করতে ছড়িয়ে পড়বে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে। জেলখানার বাইরে পাণ্ডুলিপিটি পাচার করে পাঠিয়ে দেওয়া

হয়, পরে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। আগে থেকে লুকিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেবার কারণ বোঝাই যায়— জেলের ভিতরে গোপনে গোপনে জনগণ খেপিয়ে তোলার গান ইত্যাদি রচনা করা গেলেও জেলের বাইরে প্রকাশ্যে তো নিয়ে যাওয়া যাবে না, ছাড়া পেয়ে যখন বেরুবেন তখন দেখতে পেলে কেড়ে রেখে দেবে জেলের গেটেই। এইভাবে তাঁর একটি সৃষ্টি সকলের অগোচরে হারিয়ে গেল।

যাই হোক, এক বছরের মেয়াদ একদিন শেষ হল। বহরমপুর জেল থেকে মুক্তি পেলেন ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে। বাইরের দুনিয়া থেকে সর্বমোট এক বছর তিন মাস তিনি বিচ্ছিন্ন, — খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে মুক্তির শ্বাস নিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে কিন্তু সোজাসুজি কলকাতায় তিনি ফিরে গেলেন না। কাউকে কোনো খোঁজখবর না দিয়ে সোজা চলে গেলেন কুমিল্লায়। তোমাদের নিশ্চয়ই অবাক লাগছে— এত বড়ো বিখ্যাত মানুষ এত হৈচৈ হল, অথচ জেল থেকে ছাড়া পাবার দিন বন্ধুবান্ধব, লেখক-শিল্পী, বা রাজনৈতিক কর্মী কেউই উপস্থিত থাকলেন না? আসলেই তাই। নজরুল ছাড়া পাবার সঠিক তারিখ কেউ জানতেন না। এক বছরের সাজা হওয়ায় জেল থেকে তাঁর বেরুবার কথা জানুয়ারি মাসে। কিন্তু জেলের নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন হিসেব-নিকেশ আছে, সেই নিয়মের অঙ্কে তাঁকে জেল খাটতে হয়েছিল এগারো মাস, বারো মাস নয়। হিসেবের এই বিভ্রাটের কারণেই রাজবন্দিদের ছাড়া পাবার মুহূর্তে সচরাচার যেমন ভিড় হয়, বক্তৃতা হয়, সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়, কবির ক্ষেত্রে তেমন কোনো কিছুই ঘটে ওঠার সুযোগ ছিল না। তবু অবশ্য একেবারেই যে কিছু হয় নি, তা ঠিক নয়। বহরমপুরের স্থানীয় লোকজন তাঁকে সংবর্ধনা দিয়েছিল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কুমিল্লা চলে যাওয়ারই-বা কী কারণ? এই শহরেই পুলিশ তাঁকে ধরেছিল এক দিন, তাই কি মুক্তজীবন সেখান থেকেই ফের শুরু করা? অবশ্য আরো এক কারণ থাকতে পারে। চুরুলিয়ায় পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে তাঁর তখন তেমন আর সম্পর্ক ছিল না। কুমিল্লার সেনগুপ্ত মহাশয়ের পরিবারই তখন তাঁর নিজের পরিবারের মতোই। এই সংসারের গৃহকর্ত্রীকে তিনি 'মা' ডেকেছেন, তাঁরই অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করেছেন। জেলের বাইরে গিয়েই হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল— এমন কোনোখানে যাওয়া তাঁর প্রয়োজন যেখানে শরীর ও মনকে বিশ্রাম দিতে পারবেন, কিছুদিন নিজেকে অপরের হাতে ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি ও শান্তিতে নিরুপদ্রব কয়েকটা দিন কাটাতে পারবেন। নিজের বাড়ি চুরুলিয়ায় যদি না যান, তো যেতে পারেন একমাত্র কুমিল্লাতেই। যে নিরিবিলি নিভৃতি ও গার্হস্থ্য শান্তির জন্য মন উন্মুখ কলকাকাতার নিঃসঙ্গ ও কর্মমুখর জীবনে তো তা মিলবে না!

১৬

বাহিরের জগৎ থেকে যখন কবি বিচ্ছিন্ন তখন কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। "রাজবন্দীর জবানবন্দী" বেরিয়েছে গ্রন্থাকারে। প্রকাশিত হয়েছে দ্বিতীয় কাব্যের বই "দোলন-চাঁপা"। আর বেরিয়েছে কলকাতা থেকে নতুন এক পত্রিকা, তার নাম 'কল্লোল'।

পত্রিকা তো কতই বেরোয়, তা হলে 'কল্লোল' কেন বিশিষ্ট? নিশ্চয়ই কারণ আছে। তার আগে কাগজটির চেহারা কেমন, জানা যাক। মাসিক পত্রিকা, ডিমাই সাইজে আশি-নব্বুই পৃষ্ঠার আয়তন, দাম মাত্র চার আনা। সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ, আর সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ। বাংলা সাহিত্যের একেবারে মোড় ঘুরিয়ে দিল 'কল্লোল', পালাবদল ঘটাল। প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত কোনো মাসিকপত্রের সঙ্গেই এর কোনো মিল নেই। 'কল্লোল' তোয়াক্কা করে না কারো মতের কারো পথের। তার কোনো ভয় নেই দুর্নামের, তার কোনো আকাঙ্ক্ষাও নেই প্রশংসা বা সুনামের। যৌবনের আবেগে উদ্বেলিত কম্পমান কতিপয় তরুণ এসে জমায়েত হয়েছে। তারা কিছু বলতে চায়, তারা কিছু লিখতে চায়, তারা নতুন কথা শোনাতে চায় সকলকে। তারা কোনো ধর্ম মানে না, তারা কোনো সংস্কার মানে না। তারা চায় হৃদয়ের কথা অকপটে বলতে, তারা চায় নিজেদের অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে, অন্যদের শরিক করতে। দীনেশ বা গোকুল— সম্পাদক আর সহ-সম্পাদক— তো ঢালাও বলে দিলেন : 'কল্লোলে'র দরজা সকলের জন্যেই খোলা; যিনিই লিখবেন তাঁরই কাগজ। 'কল্লোল'কে যে আপন মনে করে 'কল্লোলে'র সেই তো আপন জন। এক দল নতুন মুখ দেখা দিল বাংলা সাহিত্যে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে মনীশ ঘটক, প্রবোধকুমার সান্যাল, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, জীবনানন্দ দাশ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — কে নয়? কাকে ছেড়ে কার নাম করি? 'কল্লোলে'র দায় কি শুধু লেখা ছাপবার? না, পত্রিকা তো শুধু একটি মাধ্যম, উপলক্ষ মাত্র। আসল কথা হচ্ছে— 'কল্লোলে'র চারপাশে বসে সকলের আড্ডা, মনের বিনিময়, মতের লেনদেন। 'কল্লোল' পত্রিকায় সেদিন যাঁরা লিখতে লাগলেন পরে তাঁরাই বিবেচিত হলো বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ হিসেবে।

নজরুলের মতো বাঁধনহারা প্রতিভার উপযুক্ত ক্ষেত্রই যে 'কল্লোল'। লেখা বেরুল যখন তিনি জেলে, 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে'। তাঁর বন্ধুরা সব ছিলেনই তো সেখানে— শৈলজানন্দ, পবিত্র, নৃপেন, আরো কেউ কেউ। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ সেই 'ধূমকেতু'র যুগ থেকেই। সদ্য স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে ঢুকেছে, ভীষণ পড়ুয়া ছেলে, আবার তেমনি ভদ্র, মার্জিত, রুচিশোভন। ছোটদের জন্যে অনেক বই লিখেছেন; আর বিশ্বসাহিত্য থেকে প্রচুর অনুবাদ, তাও তোমাদেরই জন্যে। বাংলা শিশুসাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ।

এঁরা যেখানে আছেন নজরুল কি না থেকে পারেন সেখানে?

মেদিনীপুরে সাহিত্যসম্মেলন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেশ, বীরের দেশ মেদিনীপুর, বহু আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের যজ্ঞশালা। এদেশেরই মেয়ে মাতঙ্গিনী হাজরা জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেবেন বেশ কয়েক বৎসর পর। যাই হোক, এই সাহিত্যসম্মেলনের আয়োজন করেছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর মেদিনীপুর শাখা। কলকাতা থেকে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা আসছেন, আসছেন পণ্ডিত, গবেষক, কবি, নাট্যকার, সাংবাদিক। নজরুলও নিমন্ত্রিত। তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। অভিনন্দনের উত্তর দিলেন তিনি আবেগপূর্ণ ভাষায়, দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি করলেন, স্বরচিত গান গেয়ে শোনালেন। সম্মেলনের বাইরেও কবি-সংবর্ধনার আয়োজন হল ঐ শহরেরই একাধিক

স্থানে। এক জায়গায় তাঁর আবেগমন্দ্রিত কণ্ঠের কবিতাপাঠ ও গান শুনে শ্রোতৃবৃন্দ এতই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে এক মহিলা উঠে এসে নিজের গলার হার খুলে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন কবিকে। এর আগে কোনো সভা-সমিতিতে এভাবে তিনি সংবর্ধিত হন নি। তাঁর প্রতি দেশবাসীর মনোভাব যেন মেদিনীপুরের ভিতর দিয়েই তাঁর নিকট বাঙ্ময় হয়ে উঠল। অভূতপূর্ব সম্মান, ভালবাসা আর উত্তেজনা বুকে নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। মাস চারেক পরেই তাঁর গীতিগুচ্ছ ও কবিতার সংকলন বেরুল, "ভাঙার গান"। এই বইয়েরই প্রথম রচনা সেই বিখ্যাত ঐকতানগীতি 'ভাঙার গান' :

কারার ঐ লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল্, কর রে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পুজোর পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি'।

গাজনের বাজ্না বাজা!
কে মালিক! কে সে রাজা!
কে দ্যায় সাজা
মুক্ত-স্বাধীন সত্যকে রে?
হা হা হা পায়ে যে হাসি,
ভগবান পর্‌বে ফাঁসি?
সর্বনাশী,
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?

ওরে ও পাগলা ভোলা,
দে রে দে প্রলয়-দোলা
গারদগুলা
জোর্‌সে ধ'রে হেঁচকা টানে!
মার হাঁক্ হৈদরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক,
ডাক্ ওরে ডাক্
মৃত্যুকে ডাক্ জীবন পানে!

নাচে ঐ কাল্-বোশেখী
কাটাবি কাল ব'সে কি?
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি'!
লাথি মার্, ভাঙ্ রে তালা!

যত সব বন্দী-শালায় —
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি'!

বইটি তিনি উৎসর্গ করলেন "মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে"। বেরুনো মাত্র সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিল এ বই। এই সঙ্গেই বেরিয়েছিল আরেকটি একই ধরনের বই, কবিতা ও গানের, "বিষের বাঁশী"। সরকার সেটিও বাজেয়াপ্ত করল।

এ-সব ঘটনার প্রায় দু' মাস পরের ব্যাপার। ১৯২৪ সালের ২৫শে এপ্রিল। নজরুল বিবাহ করলেন। কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী আশালতা (প্রমীলা) সেনগুপ্তাকে। বরের বয়েস চব্বিশ বছর এগারো মাস, আর কনের ষোল। এক জন মুসলমান, অন্য জন হিন্দু। যে-কবি পরে গাইবেন :

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?'' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

তাঁর কাছে ধর্মের বাধা, সমাজের সংস্কার ইত্যাদি বিবেচনার কোনো বিষয়ই নয়। কোনো কুসংস্কারকে তিনি ভয় পান না ঠিকই, তবু একা মানুষকে সমাজের বিরুদ্ধে লড়তে হলে কিছু কৌশল অবলম্বন না করলে চলেও না। দেশের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজই যে কী রকম গোঁড়া, হৃদয়হীন ও অনুশাসনপ্রিয় তা তো তাঁর অজানা নয়। বিবাহে প্রতিবন্ধকতা অল্পবিস্তর হল, তবে কবিকে সাহায্য করলেন তাঁর গুটিকয়েক সুহৃৎজন, বন্ধুবান্ধব। বিবাহ সম্পন্ন হল কলকাতায়, কিন্তু কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান করা হল না। গোলযোগ এড়ানোর জন্যে ভেবেচিন্তেই এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ইসলামি মতেই বিবাহ হল, কিন্তু প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কনেকে ধর্মান্তরিত করা হয নি। কবি চরম সাহস দেখালেন শুধু হিন্দুকন্যাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেই নয়, সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে এভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেও।

এখন থেকে আর কলকাতায় নয়, হুগলিতে গিয়ে তিনি বাসা বাঁধলেন। নবপরিণীতা বধূ ও বিধবা শাশুড়ি গিরিবালা দেবীকে নিয়ে তিন জনের ছিমছাম সংসার। রাস্তার ওপরে ছোট্ট এক দোতলা দালান; পুরনো বাড়ি, বাইরের দেয়ালে চুনকাম নেই, এখানে-ওখানে শ্যাওলার কালো কালো ছোপ। বাড়ির সামনে একফালি ফাঁকা জায়গা। সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি সুপারি গাছ, হাওয়ায়-হাওয়ায় মাথা নাড়ে তারা। আছে কয়েকটি সজনে গাছ। তাতে ফুল ফোটে, টুপটাপ করে ঝরে পড়ে মাটিতে। চমৎকার আড্ডার জায়গা এই গৃহপ্রাঙ্গণ। হুগলিতে থাকার সময়েই এক দিন হাজির হয়েছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা। এঁকে নিশ্চয়ই চিনতে পারছ তোমরা—এঁর বহু কবিতাই তোমাদের পড়তে হয়েছে। ছড়া লিখলেন :

কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় এক দিন গিছলাম
ভায়া লাফ দেয় তিন হাত
হেসে গান গায় দিন রাত।
প্রাণে ফূর্তির ঢেউ বয়

ধরায় পর তার কেউ নয়।

কবি তার পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন :

গোলাম মোস্তফা
দিলাম ইস্তফা।

এ-শহরেই ভূমিষ্ঠ হয় তাঁদের প্রথম সন্তান : কৃষ্ণ মোহাম্মদ, ওরফে আজাদ কামাল। পুত্রের নামকরণ-উৎসব, আকীকা। বিয়ের সময়ে গোলমালের ভয়ে প্রায় কাউকেই নিমন্ত্রণ করা হয় নি, এবারে তা যেন সুদে-আসলে শোধ হল। কলকাতা থেকে সাহিত্যিক সতীর্থের দল আমন্ত্রিত হয়ে হৈ-হৈ করে এসে পড়লেন। দারুণ অর্থাভাব নজরুলের—কোনো কর্মসংস্থান নেই, বই লিখে আর ক' পয়সা মেলে! তা বলে মানসিক ঔদার্যের কোনো কমতি নেই। পকেট শূন্য বলে কি হৃদয়ও রিক্ত হবে? খরচাপাতির বন্দোবস্ত ঠিকই জোগাড় হয়ে গেল। বন্ধুজনের ভোজসভা পরিণত হল হৃদয়ের মহোৎসবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, নজরুল-প্রমীলার প্রথম সন্তান অকালে মারা গেল, নিতান্তই শিশু বয়সে। প্রথম পুত্রশোক। প্রচণ্ড আঘাত পেলেও ধীরে ধীরে সামলে উঠলেন। এ রকম আঘাত আরও এক বার আসবে তাঁর জীবনে, মারা যাবে 'বুলবুল'। এলোমেলো লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে কবিজীবন।

১৭

বিবাহের পর নজরুলের জীবনে আরেকটি পর্যায় যেন শুরু হল। ছন্নছাড়া জীবন শেষ করে ঘর বাঁধলেন, স্বভাব কিন্তু বদলাল না। বাহ্যত গৃহী হলেন, ভিতরে ভিতরে কিন্তু তেমনিই রয়ে গেলেন—অসংসারী, বেপরোয়া, উচ্ছল। ঘরের শাসন তাঁকে বাঁধতে পারল না।

আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজনীতিতে। মহাত্মা গান্ধী হুগলিতে আসছেন, বিশাল জনসভার আয়োজন করা হচ্ছে। সারা দেশের নেতৃবর্গ জড়ো হবেন; সাহিত্যিক, গায়ক, শিল্পী অনেকেই আসবেন। উদ্যোক্তাদের দলে কবিও রয়েছেন। উদ্বোধনসঙ্গীত তৈরি নেই। এ বিপদে বাঁচাবে কে? নজরুল তো আছেন, ভয় কি! তবে, তাঁরও যে অবসর নেই—তাঁর বাড়িতে জটলা চলছে, মিটিং বসছে একটার পর একটা। তবু, কী আর করা! ঐ হট্টগোলের ভিতরেই কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রচিত হল গান, সুরসংযোজনাও সাঙ্গ হল। উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলকে গেলে শুনিয়ে দিলেন :

আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে ঐ ফুল-ফোটানো পা ফেলে ॥
... ...
আজ জাত-বিজাতের বিভেদ ঘুচি',
এক হ'ল ভাই বামুন-মুচি,
প্রেম-গঙ্গায় সবাই হ'ল শুচি রে!
আয় এই যমুনায় ঝাঁপ দিবি কে বন্দেমাতরম্ বলে'—
ওরে সব মায়ায় আগুন জ্বেলে ॥

গান রচিত হল সকালে, আর জনসভা বিকেল পাঁচটায়। কবি নিজেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে গেয়ে শুনিয়েছিলেন এই উদ্বোধনীসঙ্গীত। গাওয়া শেষ করেছেন, অমনি জনতার মধ্যে শুরু হল চাঞ্চল্য—আরো গান শোনাতে হবে। কবি গান ধরলেন :

ঘোর্—
ঘোর্ রে ঘোর্ রে আমার সাধের চরকা ঘোর
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর ॥

তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সদাই শুনতে যেন পাই
ঐ খুলল্ স্বরাজ-সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘু'রে আস্‌ল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাট্‌ল দুখের রাত্রি ঘোর ॥

'চরকার গান' আয়তনে বেশ দীর্ঘ। "বিষের বাঁশী" কাব্যগ্রন্থে এ গান তোমরা খুঁজে পাবে।

ফরিদপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। যোগ দিতে আসছেন গান্ধীজী এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আহ্বান পেয়ে নজরুলও যাচ্ছেন যোগ দিতে। সেখানে ভাষণ দিলেন, গান গাইলেন 'শিকল-পরা ছল এ মোদের এ শিকল-পরা ছল'। বাঁকুড়ার তরুণ-সমাজ ডাক দিয়েছে, তিনি ছুটলেন সেখানে। ভাষণ দিলেন, আবৃত্তি করলেন, গান গেয়ে শোনালেন। রংপুর জেলার কুড়িগ্রামে ছাত্রসমাজ ও বিদ্বজ্জন আয়োজন করেছেন সভার। নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি চললেন সেখানে। এইভাবে একের পর এক বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেখান থেকেই ডাক এসেছে সেখানেই ছুটে যাচ্ছেন। দেশের ভবিষ্যৎ যে তরুণেরাই। ওদের ডাকে চিরতরুণ নজরুল ছুটে না গিয়ে ঘরে বসে থাকবেন কী করে?

হুগলিতে অবস্থানকালীন সময়েই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ লোকান্তরিত হলেন দার্জিলিংয়ে, ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন তারিখে। চিত্তরঞ্জনকে দেশবাসীই শ্রদ্ধায় সম্মানে আদরে নাম দিয়েছিল 'দেশবন্ধু'। যিনি দেশের বন্ধু দশের দরদী তাঁরই যোগ্য উপাধি। বিখ্যাত ব্যারিস্টার, কলকাতা হাইকোর্টের ডাকসাইটে আইনজীবী। এত উপার্জন করতেন যে লোকে বলে, তাঁর কাপড়জামা নাকি য়োরোপের সবচেয়ে বিলাসী শহর পারী থেকে ধোলাই হয়ে আসত। ধনী ব্যক্তি তো অনেকেই থাকেন, কিন্তু দ্যানধ্যানে তাঁর মতো মুক্তহস্ত কে? নিজের সমস্ত সম্পত্তি দেশের কাজে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। রাজনীতিতে দেশবন্ধু প্রবেশ করেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে। কংগ্রেস পার্টির মধ্যেই উগ্রপন্থী দলের জাতীয়তাবাদী নেতা। গান্ধীজীর সঙ্গে বহু বিষয়েই মতপার্থক্য ছিল এঁর। বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেতা। নজরুল বিমূঢ় শোকাহত হয়ে পড়লেন প্রিয় নেতার মৃত্যুতে। একাধিক কবিতা-গান রচনা করলেন এ উপলক্ষে। চিত্তরঞ্জনের মৃতদেহ নিয়ে আসা হচ্ছে দার্জিলিং থেকে; নৈহাটি স্টেশন হয়ে ট্রেন যাবে—হুগলিবাসীদের পক্ষ থেকে শবাধারে মাল্য অর্পণ করা হল, তারই সঙ্গে গেঁথে দেওয়া হল নজরুল-রচিত গান 'অর্ঘ্য' :

হায় চির-ভোলা! হিমালয় হ'তে
অমৃত আনিতে গিয়া

ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের
মৃত্যু-গরল পি'য়া!
কেন এত ভালোবেসেছিলে তুমি
এই ধরণীর ধূলি?
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে
স্বর্গে লইল তুলি'!

কয়েকটি পঙ্‌ক্তির ছোট্ট কবিতা। মৃত্যুসংবাদ শুনে কবি নাকি স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল থেকে সঙ্গে সঙ্গে এই গান রচনা করেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর বেদনা থেকে উৎসারিত সব ক'টি রচনা একত্র করে "চিত্তনামা" কাব্য প্রকাশিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত শোকসভাতেও তিনি গান পরিবেশন করেছিলেন। হুগলিতে নজরুলের ব্যস্ততা কম ছিল না, তাঁকে ঘিরে তরুণসমাজে প্রাণচাঞ্চল্যের ঢেউ এসেছিল। কিন্তু এখানকার বাস তাঁকে শেষ পর্যন্ত ওঠাতেই হল; মূল কারণ অর্থনৈতিক। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। সংসার চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু হুগলি ত্যাগের পূর্বে আরেকটি কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে বসলেন। আরো স্পষ্ট ও সোচ্চারভাবে রাজনীতিতে যোগ দিলেন, দল গঠিত হল, মুখপত্র হিসেবে পত্রিকা বের করলেন।

১৮

কবি নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁর বন্ধু কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে একটা কথা বলেছেন : "গান্ধীজীর আগমনে যদিও নজরুল চরখার কবিতা লিখেছিল তবুও সে স্থির নিশ্চিত হয়েছিল যে চরখা ও খদ্দরের মারফতে দেশে স্বাধীনতা কোনো দিন আসবে না। তাই তার মন জনগণের দিকে ঝুঁকে পড়ে।"

তার মানে ঘুরেফিরে সেই একই জায়গায় এসে পৌঁছনো। আঠারো বছর বয়সে যখন পল্টনে নাম লিখিয়েছিলেন তখন জানতেন যে অস্ত্র দিয়ে লড়াই করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হয়। এখন ছাব্বিশ বৎসর বয়সে এসে বুঝলেন, নিজের শক্তি দিয়েই আদায় করতে হয় স্বাধীনতা—এটাও যুদ্ধ, তবে ভিন্ন ধরনের যুদ্ধ; দেশের আসল শক্তি দরিদ্র নিরক্ষর জনগণ, তাদের জাগাতে হবে। জনগণ না জাগলে শুধু বন্দুক কামান দিয়ে দেশের উন্নতি করা যায় না। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার জন্যে এতদিনকার সমস্ত অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন ছিল। বুঝতে পারলেন—আন্দোলন ছড়াতে হবে গ্রামে-গঞ্জে মানুষের পর্ণকুটিরে; কেবল শহরের শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত মানুষদের দিয়ে বড়ো একটা কিছু করা যাবে না, কারণ তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য। চাই সর্বহারাদের রাজনীতি। ১৯২৫ সালের শেষ দিকের ঘটনা, নভেম্বর মাস। বিপ্লবী চিন্তাধারার কয়েক জন বন্ধু হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দিন আহমদ ও শামসুদ্দীন হুসয়নকে সঙ্গে নিয়ে কবি দল গঠন করলেন : 'লেবার স্বরাজ পার্টি' অর্থাৎ মজদুর স্বরাজ দল। দল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক কাগজ বের করা হল। নাম রাখা

হল 'লাঙল'। 'লাঙল'-এর প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম, আর সম্পাদক মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কবির পল্টন-জীবনেরই এক বন্ধু। পত্রিকার মাথায় কবি চণ্ডীদাসের অমর বাণী মুদ্রিত হতে লাগল : "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"। রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন বাণী চেয়ে যেমন লিখেছিলেন 'ধূমকেতু' প্রকাশের সময়ে। কবি কয়েক ছত্র লিখে পাঠালেন :

জাগো, জাগো বলরাম,
ধরো তব মরু-ভাঙ্গা হল।
প্রাণ দাও, শক্তি দাও,
স্তব্ধ কর ব্যর্থ কোলাহল ॥

'লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যাতেই ছাপা হল কবির বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী'। ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, কুলি-মজুর ইত্যাদি বেশ কয়েকটি কবিতার একত্র মালা গেঁথে এ কবিতাটি তৈরি করা হল। দলের অফিস আর পত্রিকার অফিস একই জায়গায়, কলকাতায়। এরই মধ্যে নজরুল দু' বছরের বসবাস ছেড়ে হুগলি থেকে চলে গেলেন কৃষ্ণনগরে। প্রয়োজন মতো কলকাতায় আসা-যাওয়া চলল কৃষ্ণনগর থেকে, তবে বেশি সময় কেটেছিল কৃষ্ণনগরেই। এ সময়েরই একটা দিনের অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের সন্তান, রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে নাতি, সুগায়ক, বিপ্লবী, রাজনৈতিক কর্মী। ইংরেজি ও বাংলা দু' ভাষাতেই চমৎকার লিখতে পারতেন, বইপত্রও রচনা করেছেন উভয় ভাষাতেই। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ "যাত্রী" যদি পাও, পড়ে ফেলো। সেখানেই তিনি লিখেছেন :

> এক দিন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে কলেজ স্কোয়ার-মুখো চলেছি, হ্যারিসন রোড আর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের কোণে ফিরিওয়ালাদের হাতে একটি নতুন কাগজ নজরে পড়ল। পত্রিকাটির নাম 'লাঙল'। নতুন ধরনের নামটি লাগল ভালো। ...৩৭নং হ্যারিসন রোডে একটি মেসের দোতলায় দু'টি ঘর নিয়ে শ্রমিক-কৃষক দলের ও 'লাঙলে'র আফিস ছিল। মনে আছে সেই বিকেল বেলাটা। আমি গিয়ে হাজির হলুম সেখানে।... দু'-তিন দিন বাদে আবার গেলুম 'লাঙল' আফিসে, সেদিন হেমন্ত সরকার আর নজরুল ইসলাম, এই দু'জনের সঙ্গে আলাপ হল সেখানে। ...নজরুলের সঙ্গে আলাপ জমে গেল। সে কবিতা পড়ল, গান গেয়ে শোনালে। আমিও তাকে গান শোনালুম। কি ভালোই লেগেছিল নজরুলকে সেই প্রথম আলাপে! সবল শরীর, ঝাঁকড়া চুল, চোখ দু'টি যেন পেয়ালা, কখনো সে পেয়ালা খালি নেই, প্রাণের অরুণ রসে সদাই ভরপুর। গলাটি সারসের গলার মতো পাৎলা নয়, পুরুষের গলা যেমন হওয়া উচিত তেমনি, সবল, বীর্য-ব্যঞ্জক। গলার স্বরটি ছিল খুব ভারী, গলায় যে সুর খেলত খুব বেশি তা বলতে পারি নে, কিন্তু সেই মোটা গলার সুরে ছিল যাদু। ঢেউয়ের আঘাতের মতো, ঝড়ের ঝাপটার মতো তার গান আছড়ে পড়ত শ্রোতার বুকে। অনেক চিকন গলার গাইয়ে-র চেয়ে নজরুলের মোটা গলার গান আমার লক্ষগুণ ভালো লাগত।...'লাঙলে' বের হল নজরুলের 'নারী' কবিতাটি। এক দিনের মধ্যে 'লাঙল' সব বিক্রি হয়ে গেল, সেই সংখ্যাটা আমাদের আবার ছাপতে হোলো। নজরুলের কবিতাই ছিল 'লাঙলে'র প্রধান আকর্ষণ।

'লাঙল' বেরিয়েছিল সর্বমোট ষোলোটি সংখ্যা।

কৃষ্ণনগরে নজরুল ছিলেন প্রায় তিন বছর। এই তিনটি বৎসরই প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছিল। রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন, সাংগঠনিক কাজকর্মে সময় দিতে হচ্ছে প্রচুর। সারা দেশটাই ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে—চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, যশোহর, খুলনা,

ফরিদপুর, ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী। কোথায় নয়? তা বলে কিন্তু লেখা বন্ধ নেই। কবিতা, গান, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, সবই লিখছেন। এই ভ্রমণপঞ্জির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁর চট্টগ্রাম আর ঢাকা সফর।

১৯২৬ সালের মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হল। এ ছাড়াও আরো দু'টি সম্মেলন হয়েছিল—ছাত্র সম্মেলন ও যুব সম্মেলন। নজরুল সর্বত্রই অপরিহার্য। প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য গান লিখলেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' :

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

যুব সম্মেলনের উদ্বোধনীসঙ্গীত লিখেছেন :

চল চল চল!
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্।

ছাত্র সম্মেলনের জন্য গান বাঁধলেন :

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলে মূর্চ্ছে তুফান
ঊর্দ্ধে বিমান ঝড়-বাদল।
আমরা ছাত্রদল ॥

এ বৎসরেই নজরুল কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থী হলেন। আর রাজনৈতিক কর্মীর ভূমিকায় নয়, সরাসরি রাজনৈতিক নেতা। অবশ্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে পারেন নি।

কৃষ্ণনগর থেকে ফের তাঁকে চলে যেতে হবে কলকাতায়। তাঁর পরিবারে নতুন এক আগন্তুক এসেছে। তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান বুলবুল এখানেই জন্মগ্রহণ করে, এ-শহরে আগমনের প্রথম বছরেই।

১৯

কৃষ্ণনগরের সংসার গুটিয়ে নজরুল সপরিবারে কলকাতায় চলে এলেন। হুগলিতে যখন ছিলেন তখন থেকেই কবির শরীর ভালো যাচ্ছিল না। ম্যালেরিয়া খুব জাঁকিয়ে বসেছিল। মাঝেমধ্যেই অসুখের প্রকোপ, অথচ পরিশ্রমের বিরাম নেই, তদুপরি আছে অর্থকষ্ট। হুগলি

ও কৃষ্ণনগর দু' জায়গাতেই তাঁর কষ্ট হয়েছে সংসার চালাতে। তিনি নিজেও যেমন বুঝছিলেন যে তিনি আর একা নন, তিন-চারটি প্রাণীর ভরণপোষণের দায়িত্ব এখন তাঁর ঘাড়ে, তিনি এখন সংসারী মানুষ, তাঁর এখন নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত উপার্জন দরকার, তেমনি তাঁর শুভার্থী বন্ধুবান্ধবও এই আর্থিক দৈন্যের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কলকাতায় কবির পরিচিত মহল অনেক বড়ো, আপদে-বিপদে ডাক দিলে সকলকেই কাছে পাওয়া যাবে, সে-অর্থে কৃষ্ণনগরে তাঁর মনের আত্মীয় কম। নিজের বিবেচনায় ও বন্ধুদের পরামর্শে তাই তিনি কলকাতায় চলে এলেন ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে। প্রথমে বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের বাসায় থাকলেন কিছু দিনের জন্যে, তারপর গিয়ে উঠলেন 'সওগাত' পত্রিকার অফিসে। সেখানে ছোট ছোট দু'টি ঘর তাঁদের দেওয়া হল থাকবার জন্যে।

'সওগাত' পত্রিকার সঙ্গে কবির যোগাযোগ নতুন নয়। সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাহেবের এই মাসিকপত্রেই তাঁর রচনা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল দশ বছর আগে, 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী'। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন নিজে ছিলেন মুক্তচিন্তার প্রগতিশীল মানুষ। স্বভাবতই তাঁর কাগজে কুসংস্কার গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার কোনো স্থান ছিল না। নজরুল যখন খ্যাতির শীর্ষে তখন দেখি, তিনি যেন 'সওগাতে'রই একচেটিয়া লেখক। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র পরে এ-পত্রিকাতেই তিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছেন। যাই হোক, মাথা গোঁজার ঠাঁই দুটো ঘরের মধ্যে কোনো রকমে হল। এই ব্যবস্থাও সাময়িক, যদ্দিন না কোনো ভালো বাসা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তত দিন। অবশেষে পাওয়া গেল এণ্টালি অঞ্চলে, ৮/১ পানবাগান লেনে।

কবির সৃষ্টিশীল জীবনের আরেকটি পর্যায় এখন থেকে শুরু হল। এবারে ধীরে ধীরে অন্য এক নজরুল আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেন। কর্মী নজরুল, কবি নজরুলের এবার যেন বিশ্রামের পালা; সক্রিয় হয়ে উঠবেন সুরের রাজা নজরুল।

দুখু মিঞা লেটোর গান বেঁধেছিল। সে কোন সুদূর অতীত, তখন সে কিশোর-বয়সী। গান আর তার সঙ্গছাড়া হয় নি। নজরুল আছেন অথচ গান নেই, এমন অবস্থা অকল্পনীয়। প্রথম দিকে গেয়েছেন কেবল রবীন্দ্রনাথের গান। পরে নিজে একসময় গান লিখতে শুরু করলেন, নিজে সুর দিলেন, তখন থেকে নিজেই গাইতে লাগলেন নিজের গান। ঘরোয়া বৈঠক কি সভা-সমিতিতে তাঁর উপস্থিতি মানেই গান শোনানো। আর যাঁরা শ্রোতার দলে তাঁদের কাছে তো সারা জীবনের সঞ্চয়, বিরল এক অভিজ্ঞতা, যা আর কখনোই ভোলা সম্ভব হবে না। কিন্তু এত দিন এই গান চলছিল তাঁর কবিতা ও অন্যান্য রচনার হাত ধরে, একসঙ্গে। এখন থেকে তা আলাদা স্রোতে প্রবাহিত হবে, এল সেই সময় যখন গানে তাঁর নিমজ্জিত হওয়ার পালা।

ঘটনার শুরু প্রকৃতপক্ষে বহরমপুরে। সেখানে জেলজীবনে কর্মবিহীন অবসরে গান ছিল সময় কাটানোর সঙ্গী, আনন্দের উৎসাধার। জেল থেকে বেরুবার পর বহরমপুরের এক সঙ্গীতপ্রিয় পরিবারের সঙ্গে তাঁর আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। ঘটক পরিবার। জগৎ ঘটক ও নিতাই ঘটক এই পরিবারেরই ছেলে; সঙ্গীতের সূত্রে এঁদের সঙ্গে, বিশেষত জগৎ ঘটকের সঙ্গে, তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। পরবর্তী কালে এঁরা বহরমপুর ছেড়ে কলকাতায়

চলে যান এবং সুরকার নজরুলের সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল সময়ে এঁরা তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। তবে এ আরেকটু পরের কথা।

পানবাগান লেনের বাসায় তখন নজরুল থাকছেন। মেগাফোন কোম্পানির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটল। এর পূর্বেই তো তিনি সঙ্গীত-রচয়িতা ও গায়ক হিসেবে সর্বজনপ্রিয় হয়েছেন। সভা-সমিতিতে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক বিদ্রোহী বাণীর গান মানেই তখন নজরুলগীতি। কলের গানের রেকর্ড যাঁরা বের করেন তাঁরা তো ব্যবসায়ী। মেগাফোন কোম্পানি এরকম এক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। কর্মকর্তারা ঠিকই বুঝেছিলেন যে জনগণ নজরুলের গান যেমন ভালবাসে তাতে তাঁর গানের রেকর্ড বের করলে ভালো কাটতি হবে। কবির নিজের দিক থেকেও ছিল অর্থ উপার্জনের তাগিদ। এভাবে তিনি গানের পেশাদার জগতে প্রবেশ করলেন।

ইতোমধ্যে কিন্তু নজরুল এক অসাধ্যসাধন করে বসে আছেন, গানেরই ক্ষেত্রে। বাংলা ভাষায় তিনি গজল লিখলেন। গজল বাংলা দেশের গান নয়। গজলের জন্মভূমি ইরান বা পারস্য। সেখান থেকেই গজল ভারতবর্ষে চলে এসে উর্দু ভাষায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে। উর্দুর সঙ্গে ফার্সির ধ্বনিগত সাদৃশ্য প্রচুর, তাই উর্দুতে গজল রচনা তেমন কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের অন্য ধাঁচের ভাষা; তার শব্দসম্ভার ও ধ্বনিমাধুর্য অন্য জাতের। বাংলায় গজল রচনা তাই অপরিসীম বিস্ময়কর। নজরুল তখন কৃষ্ণনগরে। প্রায়ই কলকাতায় আসতে হচ্ছে নানান প্রয়োজনে, তখন কলকাতায় বিভিন্ন গানের জলসাতেও তাঁর ডাক পড়ছে। একবার আসর বসেছে দিলীপকুমার রায়ের বাড়িতে। বিখ্যাত নাট্যকার, হাসির গানের রাজা ডি. এল. রায় অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার। নিজে বহুভাষাবিদ পণ্ডিত মানুষ, কবি, ঔপন্যাসিক, সুরস্রষ্টা ও খ্যাতনামা গায়ক। ভারতীয় সঙ্গীতকে য়োরোপে পরিচিত করানোর মূলে এঁর অবদান অনেকখানি। মহাত্মা গান্ধী, শোনা যায়, দিলীপ রায়ের গান ছাড়া অন্য কারো গান শুনতেন না। নজরুল এঁর বন্ধুমানুষ, ফলে তিনি তো সেখানে যাবেনই। সেদিন কবি একটি ফার্সি গজল শুনিয়েছিলেন। দিলীপকুমার বললেন, অমন গজল কি বাংলাতে ইচ্ছে করলে নজরুল লিখতে পারেন না? ইচ্ছে করলেই মনে হয় পারেন। মগজে গেঁথে রইল কথাটা। কৃষ্ণনগরে ফিরে এলেন। মাথা থেকে গজল লেখার চিন্তা যায় নি। অবশেষে সক্ষম হলেন। সেই থেকে শুরু। বাংলা সঙ্গীতে নতুন একটি ধারার জন্ম হল। এর অস্তিত্ব পূর্বে কখনো ছিল না, পরেও তেমন অনুসারী হয় নি। দিলীপকুমার রায় নিজেই সে-সব গজল গেয়ে জনচিত্ত হরণ করে নিলেন, বাংলা গজলকে জনপ্রিয় করে তুললেন।

রেকর্ডের সবচেয়ে বড়ো কোম্পানি তখন হিজ মাস্টার্স ভয়েস বা এইচ. এম. ভি। বিদেশী প্রতিষ্ঠান, ইংরেজ সাহেব তার মালিক। সবচেয়ে বেশি রেকর্ড বেরোয় এখান থেকে, প্রচারও বেশি হয়। নজরুলের পরিচয় সরকারবিরোধী, ইংরেজ-বিদ্বেষী কবি বলে। স্বাভাবিক ভাবেই ইংরেজ কোম্পানির তিনি চক্ষুশূল, নজরুলকে দিয়ে গান লেখাবার চিন্তাই তাদের মাথায় আসে না। এমন সময় হরেন্দ্র ঘোষ নামে এক শিল্পী নজরুলের দু'টি কবিতার অংশবিশেষে সুরারোপ করে গাইলেন; কিন্তু কাউকে তিনি রচয়িতার নাম বললেন না, পাছে গাইতে না দেয় সেই ভয়ে। রেকর্ড বেশ বিক্রি হল। কে. মল্লিক তখন খুব জনপ্রিয় গায়ক। কবির দেশেরই লোক, বর্ধমানে বাড়ি। লোকে কাসেম মল্লিক বললে চিনত না, কে. মল্লিক নামেই তাঁর রেকর্ড বাজারে বেরুত। নজরুলের গানের খাতা হাতে

পেয়ে তিনি তা থেকে দুটো গান রেকর্ড করলেন, গ্রামোফোন কর্তৃপক্ষেরই অনুরোধে। নমুনা হিসেবে বাজারে ছাড়া হল কেমন বিক্রি হয় তা যাচাই করতে। ফল হল এই যে, কোম্পানি নজরুলগীতির বাজারদর উপলব্ধি করতে পারল। এবারে তারা কবিকে কাজে লাগাল গান রচনায়। না, এতকাল যে-সব গান লিখেছেন সে-জাতীয় গান নয়। স্বদেশী গান, বিদ্রোহের সুর, আন্দোলনের ডাক, সরকারবিরোধী রাজনীতি—এসব চলবে না। লিখতে হবে ধর্মসঙ্গীত, প্রেমের গান, গজল। কবির অর্থকষ্ট তো লেগেই আছে, অথচ এখন তিনি ইচ্ছে করলেই তা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তিনি রাজি হলেন। লিখলেন প্রচুর ইসলামি গান, সেই সঙ্গে লিখতে লাগলেন শ্যামাসঙ্গীতও। ধর্মপ্রবণ হুজুগে জাত বাঙালি; গানের কথা ও সুরের জাদুতে আপ্লুত হল হিন্দু ও মুসলমান। লিখলেন গজল, পল্লীগীতি, সাঁওতালী সুরে গান। এদেশের ধ্রুপদী সঙ্গীতকে ভেঙ্গে রাগপ্রধান বাংলা গান তৈরি করলেন। সৃষ্টি হল বাংলা ঠুংরি, এমনকি বাংলা কাওয়ালিও। কীর্তন ও শ্যামাসঙ্গীত যেমন লিখলেন, তেমনি লিখলেন নাত্ ও হাম্দ্। আজ আমরা যাকে আধুনিক গান বলছি তারও জন্ম তাঁর হাতে! এক কথায়—বাংলা গানের সাম্রাজ্য তিনি জয় করে নিলেন। তাঁর এই সৃজনশীলতা তিনি স্তব্ধ হওয়ার পূর্বে আর থামে নি।

পরে তিনি গ্রামোফোন কোম্পানিতে, অর্থাৎ এইচ. এম. ভি-তে চাকরি পেয়েছিলেন : গান শেখাবার ও গানে সুরারোপ করার দায়িত্ব। তারও পূর্বে তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খান সাহেবের। ইনিও একই পদ অলঙ্কৃত করে ছিলেন। পাঞ্জাবের লোক, কিন্তু কলকাতার বাসিন্দা হয়ে একেবারে বাঙালি বনে' গিয়েছিলেন। রাজকীয় চেহারা, সৌখিন বেশভূষা, চমৎকার মুখশ্রী, ব্যবহারে অভিজাত ও বিনম্র। আর সঙ্গীতপ্রতিভা? বিখ্যাত পল্লীগীতি-গায়ক আব্বাসউদ্দীনের স্মৃতিচারণ আছে খাঁ সাহেব সম্পর্কে : "একখানা গান দেওয়া হ'ল, গানখানা তিনি একবার পড়লেন, ব্যস হারমোনিয়াম নিয়ে তক্ষুণি সুর হয়ে গেল। এত বড় ত্বরিত সুরস্রষ্টা দেখি নি জীবনে, দেখব কিনা আর জানি না। সে সুরে কী যে যাদু মেশান থাকত জানি না, বাজারে রেকর্ড বেরোবার সাথে সাথেই বিক্রি হত গরম জিলিপীর মত।" খাঁ সাহেবকে নজরুল বলতেন 'আমার গানের ওস্তাদ'। ওস্তাদের মৃত্যুর পরে সেই একই দায়িত্ব বহন করার জন্য চাকুরিতে বহাল হয়েছিলেন তাঁরই যোগ্য শিষ্য সুরকার নজরুল।

অবশ্য এইসব তো এক দিনে হয় নি, ধীরে ধীরে ঘটে উঠেছিল, সময় লেগেছিল বেশ কয়েক বৎসর। শুধু গ্রামোফোন কোম্পানিই নয়, এ-চাকরি ছেড়ে তিনি বেতারকেন্দ্রে যোগ দিয়েছিলেন। সিনেমা-জগতেও তিনি প্রবেশ করেছিলেন : চলচ্চিত্রের কাহিনী নির্মাণ করেছেন, চিত্রনাট্য লিখেছেন, সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন, এমনকি অভিনয়ও করেছেন একটি ছবিতে। সবই কিছু আগে-পরের ঘটনা।

পুরনো কথায় ফিরে যাই। কলকাতায় ফিরে তো এলেন কৃষ্ণনগর থেকে; হাত একেবারে খালি। বঙ্গমহলের, বিশেষ করে 'সওগাত' পত্রিকার, চেষ্টাতেই কবি-সংবর্ধনার আয়োজন করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, জাতির পক্ষ থেকে তাঁর যোগ্য সম্মান প্রদর্শন। এর ভিতরে অবশ্য গোপন আরো একটি অভিসন্ধি আছে শুভানুধ্যায়ীর—অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে তাঁকে আর্থিক সহায়তা দান করা। ঘটনাটি বিস্তারিত বিবৃত করেছেন গবেষক ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল-চরিতমানস' বইয়ে।

১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর। কলকাতার এলবার্ট হলে সংবর্ধনা। লোকে লোকারণ্য। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করে বসে আছেন বিখ্যাত রসায়নবিদ বিজ্ঞানী ও

স্বদেশপ্রেমিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এসেছেন দেশবরেণ্য জননেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এসেছেন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, রাজনীতিবিদ, ছাত্র, অধ্যাপক, নারী, পুরুষ—কে নয়? অপরূপ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন আচার্য রায় :

আজ বাঙলার কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের জাদুকরী প্রতিভায় বাঙলাদেশ সম্মোহিত হয়ে আছে। তাই অন্যের প্রতিভা তেমন করে ধরা পড়ছে না। আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকার মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল। নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন।

আজ আমি এই ভেবে বিপুল আনন্দ অনুভব করছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙলার কবি, বাঙালীর কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু বাঙালী জাতি তাঁকে শুধু বাঙালীরূপেই পেয়েছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কবিরা সাধারণতঃ কোমল ও ভীরু কিন্তু নজরুল তা নন। কারাগারে শৃঙ্খল প'রে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা বাঙালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।

সভাপতির ভাষণ শেষে 'নজরুল সংবর্ধনা কমিটি'র পক্ষ থেকে মানপত্র পাঠ করা হল। পড়ে শোনালেন নামকরা ব্যারিস্টার ও প্রখ্যাত গদ্যলেখক এস. ওয়াজেদ আলী। বিপুল করতালির মধ্যে কবিকে সোনার দোয়াত-কলম ও রৌপ্যাধারে মানপত্রখানি উপহার দেওয়া হল। অভূতপূর্ব এই সম্মানের প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে কবি আবেগমথিত চিত্তে উঠে দাঁড়ালেন। শ্রোতৃবৃন্দের জয়োল্লাস ও আনন্দধ্বনি আর থামে না; প্রায় পনেরো মিনিট স্তব্ধ, অভিভূত দাঁড়িয়ে রইলেন। জনতা শান্ত হলে তিনি সুদীর্ঘ লিখিত ভাষণ শোনালেন। তার মধ্যে বললেন :

বন্ধুগণ!

আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তুলে' দিলেন, আমি তা' মাথায় তুলে' নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটীমাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।

বললেন :

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই 'ভালো লেগেছে'-টাকে ভালো ক'রে বল্‌তে পারার এই উৎসবে আমার একটীমাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতি-নমস্কার নিবেদন করা। আমার কাছে আজ সেইটুকুই গ্রহণ ক'রে মুক্তি দিন।...

... ...

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন, তাঁদের মত হলুম না বলে'—তাঁদেরকে আমার অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের ক'রে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি ব'লেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম্ম।...

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখি নি, তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্ত্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির

মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ ক'রে দেখার স্তব-স্তুতি।

কবির কৃতজ্ঞতা নিবেদন শেষ হলে সভাপতি অনুরোধ জানালেন নেতাজীকে কিছু বলবার জন্যে। সংক্ষিপ্ত অথচ আবেগস্পন্দিত ভাষণে তিনি যা বললেন তার তুলনা নেই :

স্বাধীন দেশে জীবনের সাথে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নাই। দেশ পরাধীন বলে এ দেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুলে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানা দিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করব। কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন তিনি। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা কম—অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে, নজরুল একটা জীয়ন্ত মানুষ।

কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতেই বুঝা যায় যে, তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ।

তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছা হ'ত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।

নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয়—এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্টই বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব—তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখন তাঁর গান গাইব।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মত প্রাণ-মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।

সভা শেষ হওয়ার পূর্বে জনতার অনুরোধে কবি দু'টি গান গেয়ে শোনালেন : 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' এবং 'টলমল টলমল পদভরে'। দ্বিতীয় গানটি 'সমর-সঙ্গীত' শিরোনামে তাঁর "প্রলয়-শিখা" কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। এই গান কি তোমরা শুনেছ? সে যে কী উন্মাদনায়, বীরত্বব্যঞ্জক গান! যথার্থই যেন বুকের মধ্যে যুদ্ধের রণদামামা বাজতে থাকে :

টলমল টলমল পদভরে,
বীরদল চলে সমরে ॥

খরধার তরবার কটিতে দোলে
রণন ঝণন রণ-ডঙ্কা বোলে।
ঘন তূর্য-রোলে
শোক-মৃত্যু ভোলে,

দেয় আশিস্ সূর্য সহস্র করে ॥

চলে শ্রান্ত দূর-পথে
মরু দুর্গম পর্বতে,
চলে বন্ধুবিহীন একা।
মোছে রক্তে ললাট-কলঙ্ক-লেখা।
কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী—এ কি বলিদান!
জাগে নিঃশঙ্ক শঙ্কর ত্যাজিয়া শ্মশান!
দোলে ঈশান-মেঘে কাল প্রলয়-নিশান!
বাজে ডম্বরু, অম্বর কাঁপিছে ডরে ॥

"প্রলয়-শিখা" বেরিয়েছিল পরের বছর। রাজদ্রোহের ভয়ে যে-সব কবিতা ও গান পূর্বে কোনো গ্রন্থে গ্রন্থিত হয় নি, সেগুলো এতে স্থান পেল। ফলে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটি যথানিয়মে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হল এবং তাঁকে ছ' মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। তবে কবির ভাগ্য এবারে সুপ্রসন্ন—তাঁকে জেলে যেতে হল না! প্রথমে, জামিনে ছাড়া পেলেন। পরে, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দণ্ড থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এরকম না-ঘটলে কাব্যরচনার জন্যে তাঁকে দ্বিতীয় বার কারাবরণ করতে হত।

২০

মানুষের জীবনে দুঃখের শেষ নেই। আগের চেয়ে কবি এখন বেশ শান্তিতে আছেন। সঙ্গীতের ভুবনে নিজকে ছড়িয়ে দেবার পর অর্থচিন্তা অনেকটা কমেছে। সংসারে শ্রী ফিরে এসেছে। সাংসারিক অর্থে সুখের মুখ তিনি কেবল দেখতে আরম্ভ করেছেন, ঠিক এমনি সময়ে ভীষণ ঝঞ্ঝায় সব তছনছ করে দিয়ে গেল।

কবির দ্বিতীয় সন্তান বুলবুল। কৃষ্ণনগরে থাকার সময়েই সে এসেছিল বাবা-মা'র সব শোকদুঃখ ভুলিয়ে দিতে। নজরুল-প্রমীলার প্রথম সন্তান হুগলিতে অকালে চলে যায়। প্রথম সন্তানের মৃত্যুশোক তাঁরা ভুলেছিলেন বুলবুলকে পেয়ে। ডাকনাম বুলবুল, ভালো নাম অরিন্দম খালেদ। যাঁরাই দেখেছেন এই শিশুকে তাঁরাই বলেছেন—মায়া কাড়বার কী যে মায়াবী ক্ষমতা ছিল তার! আর স্বভাবে-ব্যবহারে ধরনধারণে পিতার হুবহু প্রতিকৃতি যেন। ঐ শিশু বয়সেই সঙ্গীতের প্রতি কী যে নাড়ির টান ছিল ঐ ছেলের! মাত্র সাড়ে তিন বৎসরের এই শিশুও সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে চলে গেল। বসন্ত রোগে মৃত্যু। শরীরের কোনো স্থান বাকি ছিল না। অসুখের মধ্যেও মুহূর্তের জন্যেও বাবাকে না দেখলে তার চলবে না। রুগ্‌ণ শিশুর শিয়রে বসে পুত্রের সেবা করছেন নজরুল; কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাফিজের রুবাই অনুবাদ করছেন, সেও ছেলের মাথার কাছে বসেই। কিন্তু সন্তান আর ভালো হল না। ১৯৩০-এর মে মাসে সে চলে গেল। পরে পুত্রের রোগশয্যায় রচিত অনুবাদ "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ" যখন গ্রন্থাকারে বেরুল, অশ্রুসজল চোখে কবি অকালপ্রয়াত শিশুসন্তানকে তা উৎসর্গ করলেন :

বাবা বুলবুল,

তোমার মৃত্যুশিয়রে ব'সে "বুলবুল-ই-শিরাজ" হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি। যেদিন অনুবাদ শেষ ক'রে উঠলাম, সেদিন তুমি—আমার কাননের বুলবুলি—উড়ে গেছ! যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্তান ইরানের চেয়েও সুন্দর?

আমাদেরও চোখ জলে ভরে আসে।

বুলবুলের মৃত্যুতে কবি এত আঘাত পেলেন যে, প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেলেন। বুলবুলের বয়স যখন দু' বছর, তাঁরা তখনও কৃষ্ণনগরে, কবি তাঁর গজল গানের প্রথম সংকলন প্রকাশ করেছিলেন; বইটির নাম রেখেছিলেন "বুলবুল"। পুত্রের খুব সখ ছিল 'ভোঁ-গাড়ি'তে, মানে ট্যাক্সিতে চড়ার। ছেলেকে তো বিধি কেড়ে নিলেন কিন্তু সেই স্মৃতি মনে করে নজরুল একটা দামি মোটরগাড়ি কিনেছিলেন। বুলবুল উড়ে গেছে সে অনেক দিন। তখন তিনি গ্রামোফোন কোম্পানিতে সঙ্গীতরচনার কাজে দিনরাত ডুবে আছেন। রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেছেন, কিন্তু পুলিশের চোখ তাঁর পিছু ছাড়ে নি। এক দিন হঠাৎ পুলিশ তাঁর বাড়িতে হানা দিল ভোরবেলায়। খানাতল্লাশি করবে। কবি কোনো আপত্তি করেন নি, পুলিশের কাছে আইন মোতাবেক সার্চওয়ারেণ্ট ছিল। এই পুলিশ দলেরই এক অফিসার পঞ্চানন ঘোষাল লিখে গেছেন :

...এতক্ষণ কাজী সাহেবও তাঁর গৃহের অন্যান্য প্রতিটি কক্ষের প্রতিটি বাক্স খুলতে ও দেখতে বরং সাহায্য করছিলেন। অবশ্য সত্য কথা বলতে হলে বলবো কোন বাধা দিচ্ছিলেন না। কিন্তু একটি বাক্স গোয়েন্দা অফিসার খুলবার উপক্রম করা মাত্র কাজী সাহেব সেখানে ছুটে এসে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—'না, না, ওটাতে হাত দেবেন না!' তাঁকে এইভাবে হঠাৎ বিচলিত হতে দেখে পুলিশের সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। ঐ বাক্স উপুড় করা মাত্র কাজী সাহেবের চোখ হতে ঝর-ঝর করে জল ঝরে পড়লো।...ঐ বাক্সে কিছু শিশুর খেলনা ও শিশুর ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ছিল। এগুলি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম [আসলে দ্বিতীয়] পুত্র স্বর্গত বুলবুলের ব্যবহৃত সামগ্রী। যাতে এতোদিন অন্য কেউ হাত দিতে সাহস করে নি, তাতে আজ এই পুলিস প্রথম হাতের স্পর্শ দিয়েছে।

বুলবুলের মৃত্যুশোক কবি কখনোই ভুলতে পারেন নি। এই দ্বিতীয় পুত্রটির মৃত্যুর মাস কয়েক পূর্বে তাঁদের কোলে আরেক শিশুপুত্র এসেছেন—সানি ওরফে কাজী সব্যসাচী, আরো দু' বৎসর পরে নিনি ওরফে কাজী অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। দুই পুত্র থাকলেও বুলবুলের শোক তাতে প্রশমিত হয় নি। প্রথম কিছুদিন তো প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন।

কাজের চাপ আছে, ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন, কিছু রচনা করছেন কোথাও বসে, প্রকাশকের দোকানে হয়তো বইয়ের প্রুফ দেখছেন—কান্নার বিরাম নেই। কেঁদে কেঁদে দু-চোখ লাল—এই দৃশ্য বন্ধুবান্ধব পরিচিত জন অনেকেই দেখেছেন।

এহেন তীব্র শোক ভুলবার জন্যই হয়তো তিনি একের পর এক অজস্র ধরনের কর্মচাঞ্চল্যে নিজেকে জড়ালেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে সংখ্যাতীত গান লিখলেন তিনি এবং সুর দিলেন। ১৯৩০-এ বুলবুলের মৃত্যুর পর থেকে ১৯৩৫ সালের ভিতরে তাঁর বারোটি সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' কোম্পানিতে চাকরি নিলেন ১৯৩৫ সালেই। পূর্ববর্তী বৎসরে বিবেকানন্দ রোডে 'কলগীতি' নামে একটা রেকর্ডের দোকানও দিলেন। ১৯৩১ থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সিনেমা ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে। এ-সবের ফাঁকে ফাঁকে আবার আছে বিভিন্ন স্থানে ছুটে বেড়ানো, বিভিন্ন ধরনের সম্মেলনে যোগদান, কখনো-বা

শুধুই ভ্রমণ : দার্জিলিং, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা। কবি শেষ বারের মতো ঢাকা আসেন ১৯৪০-এর ডিসেম্বরে। এখানে বসেই লিখলেন একটি কবিতা 'দুর্বার যৌবন'। যৌবনের এমন আবাহন বাংলা কবিতায় খুব কমই আছে :

জাগো দুর্মদ যৌবন! এসো, তুফান যেমন আসে,
সুমুখে যা পাবে দ'লে চ'লে যাবে অকারণ উল্লাসে।
আনো অনন্ত-বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি,
কূলের আবর্জ্জনা ভেসে গেলে হবে না কাহারও ক্ষতি।...
খোলো অর্গল পাষাণের, খুশী বহুক অনর্গল,
ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে যেমন ওড়ে পারাবত দল।
সাগরে ঝাঁপায়ে পড় অকারণে, ওঠ দূর গিরি-চূড়ে,
বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে।...

১৯৪০ সালেই তিনি যুক্ত হলেন অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা শাখার সঙ্গীত-বিভাগের সঙ্গে। এ বছরেই দৈনিক পত্রিকা হিসেবে 'নবযুগ' পুনরায় প্রকাশিত হল। বিশ বছর আগে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ও তিনি যুগ্মভাবে এর সম্পাদক ছিলেন; এবারেও পত্রিকায় স্বত্বাধিকারী দেশনেতা শেরে বাংলা ফজলুল হকের অনুরোধে তিনিই সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

১৯৪১ সালের ৫ই ও ৬ই এপ্রিল। কলকাতার মুসলিম ইন্সটিট্যুট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির রজতজয়ন্তী উৎসব। পন্টন থেকে ফিরে এসে এই সমিতির অফিসেই তিনি তাঁর ডেরা বাঁধতে পেরেছিলেন। সেই সমিতির পঁচিশ বর্ষপূর্তি উৎসব। অনুষ্ঠানে সভাপতি কাজী নজরুল ইসলাম।

সভাপতির ভাষণ দিলেন কবি। তাঁর জীবনের শেষ অভিভাষণ। অনেক কথাই তিনি বলেছিলেন সেদিন। হঠাৎ এক জায়গায় নিজের সম্পর্কে বললেন :

> যদি আর বাঁশী না বাজে—আমি কবি বলে বলছি নে—আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি—আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন—আমায় ভুলে' যাবেন। বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসি নি, আমি নেতা হতে আসি নি—আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম—সে প্রেম পেলাম না ব'লে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।
>
> ...আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্ম্মজীবনে অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম—অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম—আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর। আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না—তবু আপনারা আদর ক'রে যখন নেতৃত্বের আসনে বসান, তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারি না। ...আমাকে কেবল মুসলমানের বলে' দেখবেন না—আমি যদি আসি, আসব হিন্দু-মুসলমানের সকল জাতির উর্দ্ধে যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাঁরই দাস হয়ে।

কী ব্যাপার? কোথায় তিনি যাবেন, কোথে কেই-বা ফিরে আসবেন? তাঁর বাঁশি আর বাজবে না-ই বা কেন?

গভীর অনুভবে তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর দিন সমাগতপ্রায়? তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখশোক কি তাঁকে এতই নিদারুণ অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছে যে তিনি ভয়াবহ পরিণতির কথাও ভাবতে শুরু করেছেন? কে জানে!

তবে তাঁর দুঃখশোকেরও তো সীমা-পরিসীমা নেই। বুলবুলের চিন্তা থেকে মুহূর্তের

জন্যেও রেহাই নেই। এর মধ্যে আবার পত্নী প্রমীলা নজরুল গুরুতর অসুখে পড়লেন, ১৯৩৯ সালে। জীবন-মৃত্যুতে টানাটানি। বহু চেষ্টার পরে বেঁচে উঠলেন ঠিকই, কিন্তু কোমরের নিচে থেকে দেহ অবশ অসাড় হয়ে গেল। নিম্ন অঙ্গের পক্ষাঘাত। এরকম পঙ্গু অবস্থাতেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরো সুদীর্ঘ তেইশটি বৎসর কাটাতে হবে তাঁকে। স্ত্রীকে নিরাময় করার জন্য কবি যে কী পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেছিলেন তার তুলনা নেই। পানির মতো পয়সা খরচ হল, অথচ কোনো লাভ হল না। গাড়ি বিক্রি করে ফেলতে হল, বাজারে ধার-দেনা শুরু হল। যে নিঃস্ব অবস্থায় একদা জীবন শুরু হয়েছিল, আবার সেখানেই ফিরে চললেন তিনি। স্ত্রীর চিকিৎসা, সংসারের দায়িত্ব—দুই পুত্র বড়ো হচ্ছে, তাদের জন্য পিতার কর্তব্যপালন। সব মিলিয়ে অসহনীয় মানসিক অবস্থা। দুঃসহ দিন তখন এভাবেই কাটছে।

রবীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হলেন ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ, ১৯৪১-এর ৭ই আগস্ট। বয়েস অবশ্য যথেষ্ট হয়েছিল, আশি বছরেরও একটু বেশি। তাতে কী? রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার কি কোনো বয়স আছে? মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বেও অপারেশন টেবিলে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সৃষ্টিশীল ছিলেন, তাঁর শেষ কবিতা লিখে গেলেন। পৃথিবীর কোনো জাতির জীবনে রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য কোনো প্রতিভা আসেন নি যিনি স্বদেশের মাটি, দেশের মানুষ, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। আর নজরুলের কাছে এও তো প্রায় ব্যক্তিগত শোক। কৈশোরে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করেছেন, তারুণ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া তাঁর কণ্ঠে আর কোনো গান ছিল না। মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্রই সারা কলকাতা শহর নেমে পড়ল রাস্তায়। অশ্রুসজল সকলের চোখ, কবিরও। কবিতা লিখলেন 'রবিহারা', বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করলেন। তাঁর স্বকণ্ঠের এই আবৃত্তির রেকর্ডও বেরুল পরে। গান লিখলেন, 'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত কবিরে'। নিজেই গাইলেন, রেকর্ডের মাধ্যমে প্রচারিতও হল। এর পরও আরেকটি কবিতা রচনা করলেন, 'সালাম অস্তরবি'। এটিও প্রচারিত হল কলকাতা বেতার থেকে।

এর প্রায় এক বছর পরের ঘটনা। ১৯৪২ সালের জুলাই মাস। ৯ই জুলাই কলকাতা বেতারে ছোটদের আসরে নজরুল গল্প শোনাবেন। আসর পরিচালনা করছেন কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শুরু হল, কবি গল্প বলা শুরু করলেন। কিন্তু এ কী! কবি দু-একটি কথা বলেই থেমে গেলেন কেন? বন্ধু নৃপেন প্রমাদ গণেন। কিছু জিজ্ঞেসও করা যায় না, কেননা তা হলে বেতারে সে-প্রশ্নও যে শ্রোতারা শুনতে পাবে! তারপরেই লক্ষ করলেন, কবি চেষ্টা করছেন কথা বলতে, কিন্তু পারছেন না। গোলমাল বুঝতে পেরে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ শ্রোতাদের উদ্দেশে বলে দিলেন যে কবি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনিই গল্পটা পড়ে দিচ্ছেন। বেতারের অনুষ্ঠান বন্ধ হল না, অনুষ্ঠান-পরিচালক সব সামলে নিলেন।

এর পরবর্তী ইতিহাস দীর্ঘ, করুণ এবং বৈচিত্র্যহীন। কবির এই অসুস্থতা মানসিক। মস্তিষ্কের কিছু স্নায়ুতন্ত্রীর বিকলতা। ১৯৪২-এর ৯ই জুলাই রোগের প্রথম আক্রমণ বটে, কিন্তু ব্যাধির অগ্রগতি আর রোধ করা যায় নি। কবি প্রথমে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেললেন, তারপরে লেখার শক্তিও—লেখা অর্থে সৃষ্টিকর্ম বলছি না, স্রেফ হাতের লেখার কথা বলছি। আমাদের দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে আমরা যা-কিছু করি তা মগজ করায় বলেই করতে পারি। কবির অসুখ মগজে, তাঁর মস্তিষ্ক ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। এর মধ্যে কত

কিছুতে সারা দেশ তোলপাড় হয়ে গেল। কত ভাঙ্গন, কত ঘোলা স্রোত। হিন্দু-মুসলমান একে অন্যকে হত্যা করল, ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, দেশ গরিব হতে লাগল। নজরুল জীবিত, অথচ আসলে বেঁচে নেই। দেহই শুধু বেঁচে আছে, কিন্তু মন, হৃদয়, মেধা সম্পূর্ণ অসাড়, অনুপস্থিত, মৃত। জাতির দুঃসময়ে কি সুদিনে যাঁর কণ্ঠ হয়তো স্পষ্ট সাবধানবাণী উচ্চারণ করত, কিংবা পথ নির্দেশ করত, তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ।

ব্রিটিশ এদেশ থেকে চলে যাবার আগে অখণ্ড ভারতবর্ষকে দু' টুকরো করে গেল, ১৯৪৭-এর আগস্ট মাসে। কবির মস্তিষ্কে কিছুই রেখাপাত করে না। কবিবন্ধু খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন তাঁকে শেষ দেখা দেখতে গেলেন ১৯৪৮-এ; তিনি ঢাকায় চলে আসবেন, আর হয়তো কবির সঙ্গে দেখা হবে না। কবি চিনতে পারেন না বন্ধুকে। দেখে হাসলেন ঠিকই, কিন্তু সে-হাসি একেবারেই অবোধ শিশুর হাসি। এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন খান সাহেব। কবি যেন কিছু আঁকিবুকি কাটলেন :

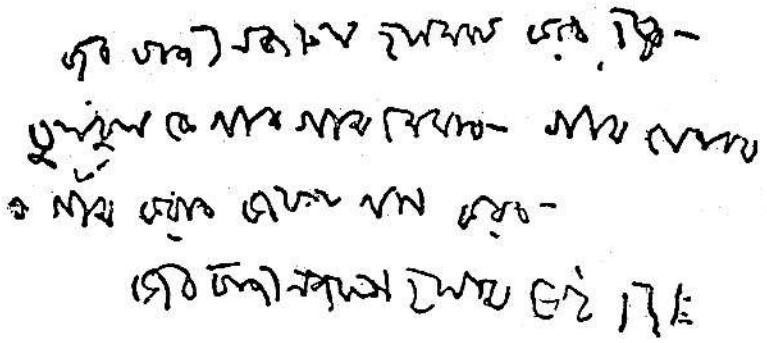

অনেক কষ্টে সেই চারটি লাইনের মর্মোদ্ধার করা গেল :

কবি কাজী নজরুল ইসলাম কবে চির
বুলবুলকে গান গান শেখাব—গান শেখাব
গান করার কবিতা গান করব—
কবি কাজী নজরুল ইসলাম চিরদিন

যত দিন যেতে লাগল, কবির অবস্থা শোচনীয় হতে লাগল। তারপর একসময় তিনি আর কিছু লিখতেই পারলেন না। একটি শব্দ, একটি অক্ষর পর্যন্ত নয়।

কবির অসুখ যে মস্তিষ্কে তা প্রথম দিকে কেউ ধরতে পারেন নি। তাই গোড়ার দিকের চিকিৎসা সবই ব্যর্থ হয়েছে। আর রোগের স্বরূপ যখন ধরা পড়ল, তখন দেখা গেল—রোগ এতদূর এগিয়ে গেছে যে কিছুই আর করার নেই। কবির এইসব অসহায় দিনগুলোর কথা লিখে রেখেছেন তাঁর বন্ধু সুফী জুলফিকার হায়দার। তাঁর বই "নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়" যদি পাও, পড়ে দেখো; বিস্তারিত সব জানতে পারবে।

দেশের চিকিৎসায় কোনো ফল পাওয়া গেল না। তখন বিদেশে পাঠানো হল। কবি তো নিঃস্ব। 'নজরুল সংবর্ধনা কমিটি' তৈরি করে চাঁদা তুলে টাকা জোগাড় করে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। প্রথমে লণ্ডনে, পরে সেখান থেকেই ভিয়েনায়। রোগ শনাক্ত চূড়ান্তভাবে

হল ভিয়েনাতে। ডাক্তার হান্স হফ্ রায় দিলেন—কবির অসুখের নাম 'পিকস্ ডিজিজ', মস্তিষ্কের কিছু বিশেষ স্নায়ুতন্ত্রী শুকিয়ে গেছে, ভালো হওয়া অসম্ভব। লণ্ডন-ভিয়েনা-কলকাতার সব রিপোর্ট জড়ো করে পাঠানো হল সোভিয়েত ইউনিয়নে। মনের মধ্যে সকলেরই ক্ষীণ আশা—যদি সোভিয়েত দেশের ডাক্তাররা ভিন্ন মত পোষণ করেন; যদি বলেন যে, আরোগ্য হওয়া সম্ভব। না, বৃথাই চেষ্টা। তাঁরাও বললেন, কোনো আশা নেই।

১৯৪২ থেকে ১৯৭৬—সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর কবি এইভাবে বেঁচে ছিলেন, জীবন্মৃত। ব্যক্তিগত কত দুঃখ এল, কত শোক এল; কিন্তু কিছুই তাঁকে আর স্পর্শ করে না। ষোলো বছরের যে-মেয়েটিকে তিনি ঘরে এনেছিলেন সমাজের তোয়াক্কা না করে, শুধুই নিজের হৃদয়ধর্ম শুনে, সেই মহীয়সী মহিলা পঙ্গু অবস্থাতেই স্বামীসেবা করে গেছেন, সংসার চালিয়েছেন। এক দিন তিনিও চলে গেলেন। ১৯৬২ সালে, মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে। অসহায়, উন্মাদ কবিকে কার হাতে রেখে গেলেন প্রমীলা? তাঁদের কোনো কন্যাসন্তান ছিল না। দুই পুত্র, পুত্রবধূ—এঁরাই তত্ত্বাবধান করেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ, কবির 'নিনি', মারা গেলেন মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে। কবির যদি চেতনা থাকত, যদি তিনি সুস্থ থাকতেন, তা হলে তৃতীয় বার পুত্রশোক পেতে হত তাঁকে।

কাজী সব্যসাচীই শুধু বেঁচেছিলেন একটু বেশিদিন, পিতার মৃত্যুর পরেও তিন বছর। তবে তিনিও অকালপ্রয়াত, কেননা তাঁর বয়স তখনো পঞ্চাশ হয় নি।

ইতোমধ্যে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে—বাংলাদেশ। তাঁর জন্মভূমি না হলেও এদেশের শহরে গ্রামে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন কৈশোরে, যৌবনে। জাতির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশে কবিকে কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন ঢাকায়। শুধু কবিকে নয়, তাঁর পরিবারবর্গকেও। ১৯৭২ সালের ২৪শে মে ঢাকায় পদার্পণ করলেন কবি, দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর পরে। পরের দিন ১১ই জ্যৈষ্ঠ তাঁর জন্মদিবস। সারা বাংলাদেশে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কবির ৭৩তম জন্মদিন পালন করা হল। জনগণের পক্ষ থেকে দেশের সরকার কবির জন্য সুন্দর নিরিবিলি একটা দোতলা ভবন ঠিক করলেন; তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাক্তার, শুশ্রূষার জন্য নার্স, সব কিছুর আয়োজন করা হল। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে নাগরিকত্ব প্রদান করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি দিলেন ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে 'একুশের পদক' দেওয়া হল তাঁকে। যাঁর জন্যে এত কিছু তিনি কিন্তু সব আনন্দকোলাহলের ঊর্ধ্বে। পূর্বেও তিন বার এমন ঘটনাই ঘটেছিল। ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে 'জগত্তারিণী' পুরস্কার প্রদান করে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট. অর্পণ করে ১৯৬৯ সালে, আর ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেয় ১৯৬০ সালে। যাঁকে দেওয়া তাঁর কিছুই এসে যায় নি সেদিনও। তবু দেশ, জনগণ তাদের ভালবাসার অর্ঘ্য না দিয়ে থাকবে কী করে?

১৯৭৫ সাল থেকেই কবির স্বাস্থ্য দ্রুত অবনতির দিকে যেতে থাকে। তাঁর মন মৃত অনেক দিন, কোনো বোধ ও বুদ্ধি নেই, ঠিকই। কিন্তু দেহের ধর্ম দেহ যে করে চলে! সে বুড়ো হয়। এক পা এক পা করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। ছিয়াত্তর বৎসর খুব একটা কম সময়ও তো নয়! কবির সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার সুবিধের জন্য তাঁকে ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল। আর তাঁকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় নি।

ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ায় এখানেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সেদিন ছিল ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগষ্ট। বাংলা ১৩৮৩ সনের ১২ই ভাদ্র। রবিবার। সময় সকাল ১০টা ১০ মিনিট।

কবির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ঢাকা শহরের রাস্তায় মানুষের ঢল নামল। ঐ দিনই বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তাঁর মরদেহ দাফন করা হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে, মসজিদের পার্শ্বে।

একজন কবি চলে গেলেন। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ একটি জীবন শেষ হল। বঙ্গদেশে আর কোনো কবি নেই, যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন দু' বার। এখানেও নজরুল অনন্য। যিনি শিল্পী, যিনি ভাবুক, যিনি স্রষ্টা তিনি জীবিত ততক্ষণই যতক্ষণ তিনি সৃজনশীল। সৃষ্টিশীলতা যেদিন থেকে চলে গেল নজরুল প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই তো মৃত। অথচ দেহ জীবিত ছিল আরো চৌত্রিশ বৎসর।

এ কোন কবি জন্মেছিলেন বাংলাদেশের মাটিতে! সে কি ভুল করে? 'হিন্দু না মুসলিম ওরা জিজ্ঞাসে কোন্ জন?'—এই ধিক্কার যিনি ছুঁড়ে দেন তাঁকে হিন্দু-মুসলিম কিছুই বলার সাহস আমার হয় না। জাতীয় কবি? নিশ্চয়ই। কিন্তু সে-জাতির নাম বাঙালি। নিষ্ঠুর বিধাতা প্রচ্ছন্নভাবে হয়তো দয়াই করেছিলেন তাঁকে। বাঙালি জাতির পতন তাঁকে দেখতে হল না—ভাইয়ে-ভাইয়ে হানাহানি, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, লীগ-কংগ্রেসের যুদ্ধ, দেশ ভেঙে দু' টুকরো। কবি-ঔপন্যাসিক অন্নদাশঙ্কর রায় কী ছড়াই না লিখেছেন!

ভুল হয়ে গেছে
বিলকুল
আর সব কিছু
ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয় নি কো
নজরুল।
এই ভুলটুকু
বেঁচে থাক
বাঙালি বলতে
এক জন আছে
দুর্গতি তার
ঘুচে যাক।

আজ বিধিলিপি বলেই মনে হয়, বর্ধমানের দামাল ছেলে এখন ঢাকার বুকে শায়িত। আর কুমিল্লার যে গৌরাঙ্গী কিশোরী পদ্মা পার হয়ে চলে গিয়েছিলেন, তিনি চিরনিদ্রিতা রাঢ়-বঙ্গের একটি ছোট্ট গ্রামে— যার নাম চুরুলিয়া।

কবি যে-দিন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন কবির একমাত্র জীবিত পুত্র কাজী সব্যসাচী তখন কলকাতায়। পিতার মুখ শেষ বারের মতো তিনি দেখতে পান নি। কাজী সব্যসাচী ঢাকায় পৌঁছে দেখেন, সব শেষ। তাঁকে তড়িঘড়ি করে কবর দেওয়া হয়েছিল। ওদিকে কবির স্বগ্রামে প্রমীলা কিন্তু অপেক্ষা করে আছেন। স্বামীর পাশে চিরদিন থাকবেন বলেই না ঐ অজ পাড়াগাঁয়ে যাওয়া! বাংলাদেশের মানুষ কবিকে যে কেন সেদিন তাঁর জন্মগ্রাম থেকে ছিনিয়ে নিল, তা আমি জানি না। হয়তো তার কারণ পরম ভালবাসা, প্রিয়জনকে কাছে রাখা। কবি সজ্ঞানে থাকলে চিরনিদ্রিত হওয়ার পূর্বে কী নির্দেশ দিতেন, তা কি আমরা

জানি? এখন যদি কোনো অলৌকিক উপায়ে ঘুম ভেঙে বলে ওঠেন—আমাকে বুলবুলের কাছে নিয়ে চল! যদি বলেন—বুলবুলের মা-র বড়ো কষ্ট, অত চেষ্টা খরচাপাতি করেও যে ওকে ভালো করতে পারি নি, আমি পাশে না থাকলে তার কষ্ট যে হাজার গুণে বেড়ে যায়! তা হলে কী উত্তর দেব আমরা? আমি নিজে কোনো উত্তর জানি না।

তবে, সব ভালবাসারই তো দাবি থাকে। আমাদের ভালবাসার দাবিতেই হয়তো আমাদের কাছে তাঁকে রেখেছি। সেই দাবি তো তাঁরও আছে আমাদের কাছে। তাঁর দিক থেকেও ভালবাসারই দাবি। আমি কি তাঁর কথা শুনতে পেয়েছি বলেই এ-বই তোমাদের জন্যে লিখলুম? কী জানি! তোমাদের জন্যে রবীন্দ্রজীবনী লেখার পর থেকেই কিন্তু কত বন্ধুজন আমাকে এ-বই লিখতে বলে এসেছেন। এতদিন তো লিখি নি।

তিনি কি আমায় ভালবাসেন? তাও আমি জানি না। তবে ভালবাসার কোনো কারণ নেই। তিনি যে-কথা বলবেন সে-কথা শোনার সাহস আমার কই?

নজরুল কি শুধুই কোনো-এক বাঙালি কবির নাম? নজরুল মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস ও শক্তি, বিদ্রোহের জন্যে বুকের ভিতরে আগুন।

আমার কি অমন সাহস আছে, তাঁর যেমন ছিল? জানি, মোটেই নেই। নিজের অক্ষমতা জানি বলেই তাঁর দিকে বারংবার ছুটে যাই। তাঁর ভালবাসা পাবার কোনো যোগ্যতাই যে আমার নেই। সেই জন্যেই তো তাঁকে ভালবাসা, তাঁর সাহসের কণামাত্র যদি পাই।

তোমাদের জন্যে যে এ-বই লিখলুম তাও এই ভরসাতেই যে, মানুষ ও কবি নজরুলের সাহস যেন তোমাদেরও পরম আকাঙ্ক্ষা হয়।

কবি নজরুলের বংশলতিকা

[প্রশান্তোষ চট্টোপাধ্যায় ও কাজী খায়রুল আলম সিদ্দিকী অবলম্বনে]

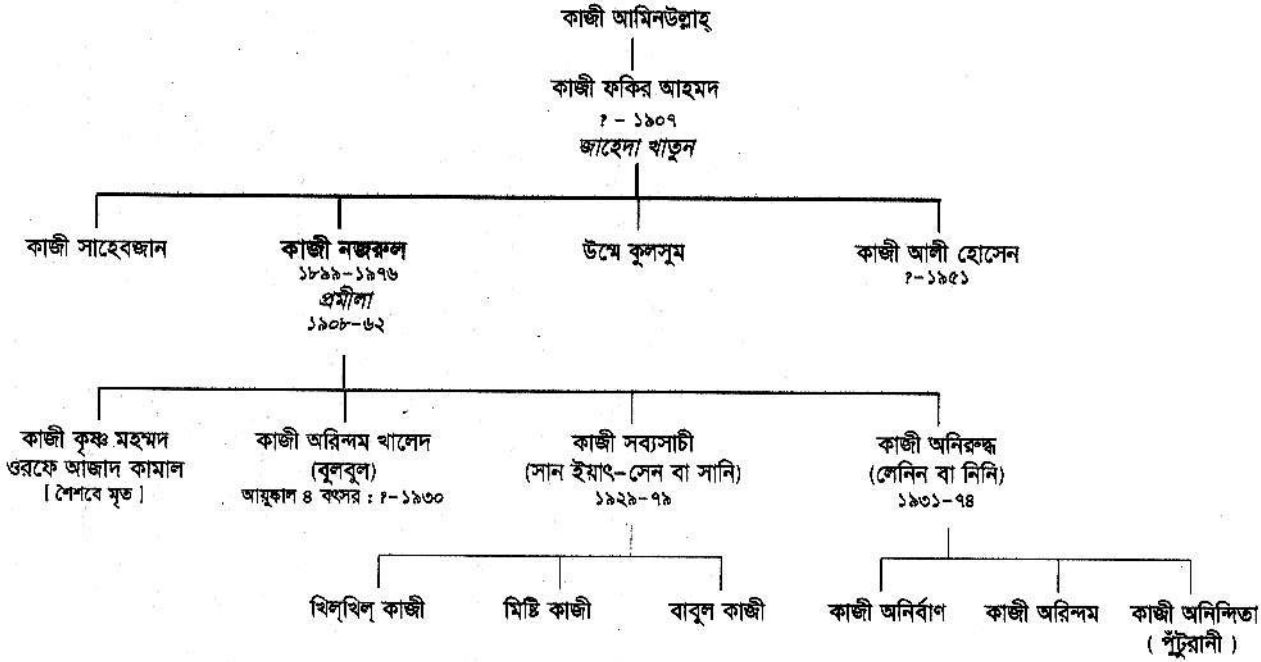

আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

নজরুলের জন্ম	:	১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ (২৪শে মে ১৮৯৯) মঙ্গলবার। বর্ধমানের একটি গ্রাম চুরুলিয়ায়। পিতা : কাজী ফকির আহমদ। মাতা : জাহেদা খাতুন।
মৃত্যু	:	১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ (২৯শে আগষ্ট ১৯৭৬) রবিবার। বেলা ১০টা ১০ মিনিট। ঢাকায়, পি. জি. হাসপাতালে ৭৭ বৎসর ৩ মাস বয়সে। অসুস্থতার শুরু ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই।
শিক্ষালাভ	:	প্রথমে গ্রামের মক্তবে। পরে বর্ধমান জেলার মাথরুন হাই স্কুলে। তারপর ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর স্কুলে। সবশেষে শিয়াড়শোল রাজ হাই স্কুলে।
পল্টনে যোগদান	:	১৯১৭ সাল।
কাব্য রচনার সূত্রপাত	:	১০/১১ বছর বয়সে। ২০ বৎসর বয়সে প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়; কবিতা নয়, গল্প।
কবিতা	:	কাব্য ও সঙ্গীতগ্রন্থ মিলিয়ে ৩৬টি।
কাব্যানুবাদ	:	৩টি বই।
ছোটগল্প	:	সর্বমোট ১৮টি গল্প, ৩টি গ্রন্থে সঙ্কলিত — 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' ও 'শিউলিমালা'য়।
উপন্যাস	:	৩টি (বাঁধন-হারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা)।
নাটক	:	৩টি (ঝিলিমিলি, আলেয়া, মধুমালা)।
শিশুসাহিত্য	:	৬টি কবিতার বই এবং ১টি নাটক।
প্রবন্ধগ্রন্থ	:	৫টি (যুগবাণী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী, ধূমকেতু)।
শেষ গ্রন্থ	:	অসুস্থ হওয়ার পূর্বে, কবিতা ও গানের সংকলন 'নির্ঝর'। এর পরেও পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদি সঙ্কলিত করে বহু বই বেরিয়েছে।
গানের সংখ্যা	:	ন্যূনপক্ষে ২৫০০।
কবিতা	:	প্রায় ৮০০।
প্রবন্ধ/আলোচনা	:	প্রায় ১০০।
ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত গ্রন্থাবলি	:	সংখ্যায় ৭টি যুগবাণী, ১৯২২ বিষের বাঁশী, ১৯২৪

ভাঙার গান, ১৯২৪
দুর্দিনের যাত্রী, ১৯২৬
রুদ্রমঙ্গল, ১৯২৬
প্রলয়-শিখা, ১৯৩০
চন্দ্রবিন্দু, ১৯৩০

পত্রিকা সম্পাদনা : ৩টি
দৈনিক 'নবযুগ'
ধূমকেতু
লাঙল

সাহিত্যচর্চার কাল : ১৯১৯ থেকে ৪২ সাল : ২৩ বৎসর।

বিভিন্ন সম্মান : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত
'জগত্তারিণী' পুরস্কার ১৯৪৫
ভারত সরকার কর্তৃক
'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রদান ১৯৬০
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত
ডি. লিট. উপাধি ১৯৬৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত
ডি. লিট. উপাধি ১৯৭৩
বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত
'একুশের পদক' ১৯৭৫

অভিনয় : 'ধ্রুব' চলচ্চিত্রে নারদের ভূমিকায়।

সঙ্গীত পরিচালনা : বিভিন্ন ছায়াছবিতে। ছায়াছবির মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'ধ্রুব', শৈলজানন্দের 'পাতালপুরী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উল্লেখযোগ্য।

চলচ্চিত্র-কাহিনী : বিদ্যাপতি (১৯৩৮)। পরিচালক : দেবকীকুমার বসু
সাপুড়ে (১৯৩৯)। পরিচালক : দেবকীকুমার বসু।

রেকর্ড নাট্য : ৭

কবিকে জানতে হলে কী কী বই তোমরা পড়বে :

রফিকুল ইসলামের 'নজরুল-জীবনী'।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ'।
খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনের 'যুগস্রষ্টা নজরুল'।
মুজফ্‌ফর আহমদের 'নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা'।
শামসুন্নাহার মাহমুদের 'নজরুলকে যেমন দেখেছি'।
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে'।
সুফী জুলফিকার হায়দারের 'নজরুল-জীবনের শেষ অধ্যায়'।

নির্ঘণ্ট

[' ' উদ্ধৃতি-চিহ্ন দ্বারা পত্র-পত্রিকা, কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ ইত্যাদি এবং " " দ্বারা কেবলমাত্র গ্রন্থের নাম বোঝানো হয়েছে।]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৪৩,৬৫,৬৯
অনুশীলন সমিতি ২৬
অন্নদাশঙ্কর রায় ৮৮
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪৮
'অর্ঘ্য' ৭৩-৪
অল ইণ্ডিয়া রেডিও ৮৪
অসহযোগ আন্দোলন ৫৩,৫৪,৫৫,৫৬

'আগমনী' ৪৬
'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' ৬২, ৬৯
আজীজুল হাকিম ৫০
'আনন্দময়ীর আগমনে' ৬০
আফজালুল হক ৪৪,৪৭,৪৮,৫১,৫২,৫৮
আব্বাসউদ্দীন ৭৯
'আমার বন্ধু নজরুল' ১৪
আলি আকবর খান ৫৩, ৫৪
আসানসোল ১১,১৭, ৩০
আশালতা সেনগুপ্তা ৫৪, ৬৬, ৭১

ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ৫৪, ৬৬

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৬৯

'উপাসনা' ৪৬
উম্মে কুলসুম ৬

এইচ. এম. ভি. ৭৮, ৭৯, ৮৩
এ. কে. ফজলুল হক (শেরে বাংলা) ৪৯,৫০,৮৪
এম. বখ্‌শ ১৭
এস. ওয়াজেদ আলী ৮০

ওমর খৈয়াম ৩৪

কংগ্রেস পার্টি, ভারতীয় ৫২, ৭৩
"কবি" ১১
'কবিগান' ৮-১২
'করুণ-গাথা' ২৮
'করুণ-বেহাগ' ২৯
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৮৭
কলকাতা বেতার ৮৪, ৮৫
কলগীতি ৮৩
'কল্লোল' ৬২, ৬৮-৯
"কল্লোল যুগ" ৪৩, ৬৫
কাজী অনিরুদ্ধ ৮৩, ৮৭
কাজী আমিনউল্লাহ্ ৫, ৬
কাজী আলী হোসেন ৬,২০
কাজী ফকির আহমদ ৫,৬,৭,৮,১৩
কাজী ফজলে আহমদ ৬
কাজী বজলে করিম ৬,৭,৮,৯,১১,২৭,৩১
কাজী রফিজউল্লাহ্ ১৭-১৮,১৯
কাজী সব্যসাচী ৮৩,৮৭,৮৮
কাজী সাহেবজান ৬,১২,৬৬
'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' ৭৬
'কামাল পাশা' ৪৪, ৪৫-৬
কুতুবউদ্দিন আহমদ ৭৪
কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৪
কৃষ্ণ মোহাম্মদ ৭২
কে. মল্লিক ৭৮
"কেউ ভোলে না কেউ ভোলে" ১৪
'ক্ষমা' ২৯, ৩৭
ক্ষুদিরাম ২৬

খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন ৬৩, ৮৬
খিলাফত আন্দোলন ৫২
'খেয়াপারের তরণী' ৪৪, ৫৫

গজল ৭৮, ৭৯
গিরিবালা দেবী ৫৪, ৭১
গোকুলচন্দ্র নাগ ৬৯
গোলাম মোস্তফা ৭১

'ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে' ৮৫

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ২৬-২৭
চণ্ডীদাস ৪৯, ৭৫
'চরকার গান' ৭৩
"চলমান জীবন" ৪৪

"চিত্তনামা" ৭৪
চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু) ৬৬, ৭৩-৪
চুরুলিয়া ৪,৫,৬,৭,১১-২,২৩,২৯,৩৬,৪০,
৬৬,৬৮,৮৮

জমিরউদ্দিন খান, ওস্তাদ ৭৯
'জাগরণী' ৫৬
'জাতির বজ্জাতি' ৩৯
জাহেদা খাতুন ৫, ৬
জীবনানন্দ দাশ ৬৯
"জীবনের ঝরাপাতা" ৩২

'টলমল টলমল পদভরে' ৮১-২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৮৭, ৮৮

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১১,৬৯

দরিরামপুর হাই স্কুল ১৮,২০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৭৮
দিলীপকুমার রায় ৭৮
দীনেশরঞ্জন দাশ ৬৯
'দুই বিঘা জমি' ১৮
'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' ৭৬,৮১
'দুর্বার যৌবন' ৮৪
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি) ৩২
'দৈনিক আজাদ' ৫০
"দোলন-চাঁপা" ৬৮

'ধূমকেতু' ৫১, ৫৮-৬০, ৬১, ৬৬, ৬৯

নজরুল ইসলাম
অনশন ধর্মঘট ৬৪-৬,৬৭-৮
অসুস্থতা ৮৫-৮
আসানসোলে ১৭
কণ্ঠস্বর ৫১,৭৫
করাচিতে ৩৩,৪৪
কারাবাস ৬০-৬
কুমিল্লায় ৫৩-৫,৫৬-৮,৬০,৬৮
কৃষ্ণনগরে ৭৫,৭৬,৭৮,৮২
চরিত্র ৫২
জন্ম ৩,৫
জন্মস্থান ৩-৬
দেওঘরে ৫২, ৫৩
পল্টনে যাওয়া ৩০-১,৩২-৬,৭৪
ফার্সি শিক্ষা ৭,২৭-৮,৩৪
বংশ-পরিচয় ৫
বহরমপুরে ৭৭-৮
বাড়ির পরিবেশ ৬-৭,৮,২৯
বিদ্যাচর্চা ১৪,১৯-২১
বিবাহ ৫৩, ৭১
ভবঘুরে জীবন ১৪
ময়মনসিংহে ১৭-৮,৫৩
মৃত্যু ৮৮
রাজনীতি ৫২-৩,৫৪-৬,৫৮-৬২,৭২-৬
রাণীগঞ্জে ২০,২১,২৯,৩০,৩৭,
লেটোর দল ১১-৩,১৪,৭৭
শৈশব-কৈশোর ৭,৯,১১-৩১
সম্মানপ্রাপ্তি ৬৯, ৭৯-৮১,৮৭
সাংবাদিকতা ৪৮,৪৯-৫১,৭৪-৫
সুরস্রষ্টা ৭৭-৯
"নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়" ৮৬
নজরুল সংবর্ধনা কমিটি ৮৬
"নজরুলের সঙ্গে কারাগারে" ৬৭
'নবযুগ' ৪৯,৫০,৫১,৮৪
নবীনচন্দ্র ইন্সটিট্যুট ১৩
নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী ৬৭
নলিনীকান্ত সরকার ৪২,৪৭,৬৫-৬,৭৭
নার্গিস আসার খানম ৫৩
'নারী' ৭৫
নিত্যানন্দ দে ৩৪
নিবারণচন্দ্র ঘটক ২৭
'নূর' ৪৪, ৫৮
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৬৯, ৮৫
নৌশেরা ৩১,৩২

পঞ্চানন ঘোষাল ৮৩
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৩,৪২-৪,৫৫,৬১-২,৬৯
পাঁচালি
পুঁথি ৮-৯
'পুরাতন ভৃত্য' ১৮
প্রফুল্ল চাকী ২৬
প্রফুল্লচন্দ্র রায় (আচার্য) ৮০
'প্রবাসী' ৪৪,৪৮
প্রবোধকুমার সান্যাল ৬৯
প্রমথ চৌধুরী ৪৩
প্রমীলা নজরুল ৬৬,৭১,৮৫,৮৭

"প্রলয়-শিখা" ৮১,৮২
'প্রলয়োল্লাস' ৫৭
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ৬২-৩
প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ৫৫,৫৬
প্রেমেন্দ্র মিত্র ৬৯

ফয়সল (রাজা) ৪৯
ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ ৩১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৮৭
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ২৬
'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ৩৬,৩৭,৪৪, ৫৮,৭৭
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি ৩৭,৩৮,৪০, ৫১,৫২,৫৩,৮৪
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৬৯
'বন্দী-বন্দনা' ৫৪
"বসন্ত" ৬১-২
'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী' ৭৭
"বাঁধন-হারা" ৪৪
বাঙালি পল্টন ৩১,৩৬
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ৪৮
'বিজলী' ৪৭-৮,৬৫
বিদ্যাপতি ৪৯
'বিদ্রোহী' ৪৪,৪৭,৪৮,৫৭
বিরজাসুন্দরী দেবী ৬৬
বিশ্বযুদ্ধ ৩০,৩৫,৭৩
"বিষের বাঁশী" ৭১,৭৩
বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ৫৪
বুদ্ধদেব বসু ৬৯
বুলবুল ৭২,৭৬,৮২-৩,৮৪,৮৯
বেঙ্গলি রেজিমেণ্ট ৩১,৩৬
"ব্যথার দান" ৫৮

"ভাঙার গান" ৭০
ভারতচন্দ্র রায় ৪৫
ভারতীয় কংগ্রেস পার্টি ৫২,৭৩

মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৭৫
মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (মহারাজ) ১৩
মনীশ ঘটক ৬৯
'মরণ-বরণ' ৫৪
মহাত্মা গান্ধী ৫৩,৫৫-৬,৭২,৭৩,৭৮
মহাযুদ্ধ ৩০,৩৫,৭৩
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৮০
মাতঙ্গিনী হাজরা ৬৯
মাথরুন স্কুল ১৩,১৪
'মাসিক মোহাম্মদী' ৫০
'মুক্তি' ২৯,৩৭
মুজফ্ফর আহমদ, কমরেড ২৭,৩৩,৩৭,৩৮, ৪০,৪২,৪৭,৪৮,৪৯,৫০,৫১,৫২,৫৫, ৫৯,৭৪,৮৪
মুসলিম লীগ ৫২
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর ৩৭
মেগাফোন কোম্পানি ৭৮
মেদিনীপুর ৬৯-৭১
'মোসলেম জগৎ' ৬৩
'মোসলেম ভারত' ৪৪,৪৭,৪৮,৫২,৫৮
মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মৌলানা ৫০
মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ৭৭
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ৩৭,৪৪
মোহিতলাল মজুমদার ৪৫,৬৯
মৌনী ফকির ২৯,৩৭

যতীন্দ্রমোহন বাগচী ৬৯
"যাত্রী" ৭৫
"যুগবাণী" ৫০,৬০
"যুগস্রষ্টা নজরুল" ৬৩
যুগান্তর দল ২৬
যুবনাশ ৬৯

'রবিহারা' ৮৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮,৪০,৪৩,৪৯,৫১,৫৩,৫৫, ৫৮-৯,৬১,৬৪,৬৬,৬৭,৭৫,৭৭,৮০,৮৫
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৮৭
"রাজবন্দীর জবানবন্দী" ৬০-১,৬৮
'রাজার গড়' ২২
'রাণীর গড়' ২২,২৩
রাশিয়া ৫৩
"রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ" ৮২

'লাঙল' ৫১,৭৫
লেটো দল ১১-৩,১৪,৭৭
লেবার স্বরাজ পার্টি ৭৪

শম্ভু রায় ৩৩
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৬

'শাত-ইল-আরব' ৪৪,৪৫,৫৫
শামসুদ্দীন হুসয়ন ৭৪
শিয়াড়শোল রাজ হাই স্কুল ২০,২১,২৭,২৮,৩০
শেখ মুজিবুর রহমান ৮৭
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৪,২০,২২,২৩,২৫,
২৭,২৮,৩১,৩২,৩৬,৩৮,৩৯,৬৯

'সওগাত' ৪৪,৭৭,৭৯
সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল ২৭
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৪৪
সন্ত্রাসবাদ ২৫,৬০
'সবুজপত্র' ৪৩
'সমর-সঙ্গীত' ৮১
সরলা দেবী চৌধুরানী ৩২
সাজেদুন্নেসা ৬
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৪৬
'সাম্যবাদী' ৭৫
'সালাম অস্তরবি' ৮৫
'সুপার (জেলের) বন্দনা' ৬৪
সুফী জুলফিকার হায়দার ৮৬
সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী) ৮০,৮১
'সেবক' ৫০,৫১,৫৮
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৫
স্বদেশী ২৫,৬০
স্বর্ণকুমারী দেবী ৩২

হরেন্দ্র ঘোষ ৭৮
হসরৎ মোহানি ৫৯
হাফিজ (মহাকবি) ৪০,৮২,৮৩
হিজ মাস্টার্স ভয়েস ৭৮,৭৯,৮৩
হেমন্তকুমার সরকার ৭৪,৭৫

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র